সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

সেপ্টেম্বর ২০১৬

মহাশ্বেতা দেবী ১৯২৬-২০১৬

উপরে

০১. ১৫ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনের চ্যান্সারি কমপ্লেক্সে ভারতের ৭০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ভারতের মহামান্য রাষ্ট্রপতির জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বাণী পড়ে শোনান ০২. ১৯ আগস্ট ২০১৬ শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা পেট্রাপোল-বেনাপোল ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি) পরিদর্শনকালে বেনাপোল সিঅ্যান্ডএফ অ্যাসোসিয়েশন এবং সীমান্তের উভয়পক্ষের কাস্টমস, ইমিগ্রেশন ও স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে ভারত ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানগণ উপস্থিত ছিলেন ০৩. একই দিনে যশোর রামকৃষ্ণ মিশন পরিদর্শনকালে শ্রী শ্রিংলা স্বামী জ্ঞানপ্রকাশনন্দ ওরফে মিন্টু মহারাজ, স্থানীয় সংসদ সদস্য স্বপনকুমার ভট্টাচার্য, অ্যাডভোকেট মনিরুল ইসলাম, যশোরের জেলা প্রশাসক হুমায়ুন কবির, মুক্তিযোদ্ধা, আওয়ামী লীগ নেতা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে মত-বিনিময় করেন

নিচে

০১. ০২ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশের শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু, এমপি-এর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ॥ ০২. ০৩. ১১ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সাক্ষাৎকালে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বিষয়ে আলোচনা ॥ ০৩. ১৭ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ও সচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সঙ্গে হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ ॥ ০৪. ১৪ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশের ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বেগম তারানা হালিম এবং সচিব মো. ফয়জুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে হাই কমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০৮ | ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৩ | সেপ্টেম্বর ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

চিলিকা হ্রদের দেশে // পৃষ্ঠা: ৪৪

০৭ থেকে ১২

মহাশ্বেতা দেবী ১৯২৬-২০১৬

মহাশ্বেতা দেবী প্রয়াত হলেন ২৮ জুলাই ২০১৬ দুপুর তিনটে নাগাদ। ১৯২৬-এ জন্ম তাঁর। সেই হিসেবে অকাল প্রয়াণ বলা যাবে না অবশ্যই। তবে আমাদের এই উপমহাদেশে তাঁর মত এক বরেণ্য লেখকের মৃত্যু নিঃসন্দেহে বেদনার। বাংলা সাহিত্য তাঁর অভাব বোধ করবে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ রায়ের যেমন বংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতে, মহাশ্বেতা দেবীরও তাই। অনন্য জীবন সংগ্রামী, প্রতিবাদী এবং আপোসহীন এই লেখক জীবৎকালই কিংবদন্তীর মহিমা পেয়েছিলেন। তাঁর মানসগঠনে শান্তিনিকেতন ছিল, বাবার অন্যতর কথাসাহিত্য ছিল, স্বামীর খ্যাপাটে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ছিল, সর্বোপরি ছিল নিজের জীবন সংগ্রামের শিক্ষা। অতি রাজনীতি সচেতনতা তাঁকে অকুতোভয় করেছিল। তিনি কখনো মন জুগিয়ে, কারো মন রাখতে কলম ধরেননি। তিনি ছিলেন প্রথাবিরোধী। ক্ষমতাসীনদের চিরকালের বিরোধীপক্ষ। নিজে যা বুঝেছেন, সত্য হিসেবে মেনেছেন, তার নির্যাস পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়াকে ব্রত বলে মেনেছেন।

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	ঢাকায় ভারতীয় শিক্ষা মেলা ০৪ *আকাশবাণী মৈত্রী* দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠবে ০৫ জয়াগে গান্ধী আশ্রমে হাই কমিশনার ০৬ সারদা পুলিশ একাডেমিতে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ভবন নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর ০৬
শ্রদ্ধাঞ্জলি	মহাশ্বেতা দেবী ১৯২৬-২০১৬ মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায় ০৭
দর্শন	সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন সজীবকুমার বসু ১৩
রাজ্য পরিচিতি	পশ্চিমবঙ্গ ১৫
কবিতা	সুমন রায়হান ॥ মিতুল সাইফ রহিমা আখতার কল্পনা ॥ দুলাল সরকার ২৪ শিখর চৌধুরী ॥ সরওয়ার মুর্শেদ ॥ জামাল আহমেদ জাফরুল আহসান ॥ পঙ্কজ সাহা ২৫
কৃতবিদ্য	রেফুল করিম ॥ উদীয়মান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ২৬
শিশুতীর্থ	কিচ কিচ কিচ ॥ আহমেদ রিয়াজ ২৭
ছোটগল্প	লুঠ ॥ সুব্রত মণ্ডল ২৯
ধারাবাহিক	পাসিং শো ॥ অমর মিত্র ৩২ চিলিকা হ্রদের দেশে ॥ দীপিকা ঘোষ ৪৪
অনুবাদ গল্প	সুখ ॥ কাশীনাথ সিং ৩৮
সৌহার্দ	ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৪২
শেষ পাতা	ঈশ্বরপ্রতিম সুনীল ॥ নান্টু রায় ৪৮

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫
e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

জানার আগ্রহ

সুন্দরম শিশু-কিশোর সংগঠন হবিগঞ্জ তথা সিলেট বিভাগের পুরনো ঐতিহ্যবাহী একটি সংগঠন। আমরা ইতোমধ্যে ২৪টি সফল নাটক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎসবে অংশগ্রহণপূর্বক সাফল্য অর্জন করেছি। শিশুদের মানসিক বিকাশের স্বার্থে আমরা বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নিয়মিত আয়োজন করছি। উল্লেখ্য, *সুন্দরম* শিক্ষা সংগ্রহশালা নামে একটি নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেখানে রয়েছে হারিয়ে যাওয়া ঐতিহাসিক নিদর্শন সংগ্রহ ও পাঠাগার। সপ্তাহে দু'দিন এটি শিশু-কিশোরদের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের স্বার্থে আমাদের শিক্ষা সংগ্রহশালায় আপনার বহুল প্রচারিত প্রকাশনা *ভারত বিচিত্রা* পাওয়া গেলে শিশু-কিশোরদের জানার আগ্রহ আরও বাড়বে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এমতাবস্থায় *সুন্দরম*কে *ভারত বিচিত্রা*র পাঠক তালিকাভুক্তির জন্য আপনার কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। শিশু-কিশোরদের স্বার্থে আমাদের *সুন্দরম* শিশু-কিশোর সংগঠনকে নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পাঠিয়ে বাধিত করবেন।

ইয়াসিন খান সাধারণ সম্পাদক
সুন্দরম, হবিগঞ্জ

বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির মনোভাব

ভারতীয় হাই কমিশন প্রকাশিত *ভারত বিচিত্রা* প্রায় তেতাল্লিশ বছর যাবৎ বাংলাদেশ ও ভারতীয় জনগণের মাঝে সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। এই পত্রিকা পাঠে বাংলাদেশের জনগণ বিশাল ভারতের বৈচিত্র্যপূর্ণ কৃষ্টি ও সংস্কৃতির সঙ্গে যেমন পরিচিত হচ্ছে তেমনি দু'দেশের জনগণের মধ্যে গড়ে উঠছে বন্ধুত্ব ও সম্প্রীতির মনোভাব, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

একসময় বিভিন্ন সূত্র থেকে *ভারত বিচিত্রা* অনিয়মিতভাবে পেতাম। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবৎ তা আর পাওয়া যাচ্ছে না। সে-কারণে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, কুষ্টিয়া শাখাকে *ভারত বিচিত্রা*র গ্রাহক হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য

আবেদন করছি।

*ভারত বিচিত্রা*র গ্রাহক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হলে জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, কুষ্টিয়া শাখার সদস্যবৃন্দ কৃতজ্ঞ থাকবে।

ম. মনিরুল ইসলাম কোষাধ্যক্ষ
জাতীয় রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্মিলন পরিষদ, কুষ্টিয়া শাখা

জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি

ফ্রেন্ডস অর্গানাইজেশন প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত গুলিসাখালী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারটি ইউনিয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত হওয়ায় এখানে প্রতিদিন ছাত্র শিক্ষক সুধী ও গুণীজনেরা বিভিন্ন বই পাঠ করে জ্ঞান আহরণ করছেন। এখানে ধর্মগ্রন্থসহ বিজ্ঞান, সাহিত্য ও জ্ঞানমূলক বইয়ের সংখ্যা হাজারেরও বেশি। কিন্তু অভাব সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা*র। চিত্ত বিনোদনের মাধ্যম ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধির সহায়ক বলে সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত প্রেরণের জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি।

মো. হাফিজুর রহমান সভাপতি
গুলিশাখালী সার্বজনীন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
ডাকঘর: গুলিশাখালী, উপজেলা: মঠবাড়িয়া
পিরোজপুর

সুন্দর প্রকাশনা

সবিনয় নিবেদন, আমাদের সংগীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান *সুরাঙ্গন সঙ্গীতালয়, চট্টগ্রাম*-এর শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা আপনার সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিতভাবে পাঠ করতে চাই। অতএব, এই সুন্দর প্রকাশনাটি নিয়মিতভাবে পাঠের সুযোগ পেলে কৃতার্থ হব।

পূরবী চক্রবর্তী অধ্যক্ষ
সুরাঙ্গন সঙ্গীতালয়, চট্টগ্রাম
চিটাগাং স্কলার স্কুল এন্ড কলেজ
৭০, শাহজাহান গলি, সদরঘাট, চট্টগ্রাম

আকর্ষণীয় সাহিত্য পত্রিকা

আমি শোভারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। ফরিদপুর জেলা সদর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে আমাদের স্কুলটি অবস্থিত। স্কুলটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্কুলটি অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। আমাদের বিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে পাঠ সমাপ্ত করে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী উচ্চতর শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়েছে।

আমাদের বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগার আছে। সেখানে উৎসাহী শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার জন্য দেশি-বিদেশি লেখক-লেখিকাদের রচিত বই এবং কতিপয় ম্যাগাজিন সংরক্ষিত রয়েছে।

জানতে পেলাম, ভারতীয় হাই কমিশন থেকে *ভারত বিচিত্রা* নামে একটি আকর্ষণীয় মাসিক সাহিত্য পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হয় এবং বিভিন্ন স্কুলে তা বিনামূল্যে প্রেরণ করা হয়। আমাদের বিদ্যালয়ের পাঠাগারের জন্য আমরা উক্ত পত্রিকা সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক।

আমাদের স্কুলের ঠিকানায় দুই কপি করে *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিত প্রেরণের জন্য আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মো. নুরুল আমিন মিয়া প্রধান শিক্ষক
শোভারামপুর উচ্চ বিদ্যালয়
অম্বিকাপুর, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর

ভারত বিচিত্রা জুন ২০১৬ সংখ্যার ১৬ পৃষ্ঠায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওপরে লিখিত প্রবন্ধে যে আবক্ষ ছবিটি ছাপা হয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নয়, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র দীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র দিনেন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের গানের ভাণ্ডারী 'দিনু ঠাকুর' নামে পরিচিত এই মানুষটি ছিলেন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পৌত্র। এই অনভিপ্রেত ত্রুটির জন্য আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। –সম্পাদক

মহাশ্বেতা দেবী আর আমাদের মাঝে নেই। অনন্য জীবন সংগ্রামী, প্রতিবাদী এবং আপোসহীন এই লেখক জীবৎকালই কিংবদন্তীর মহিমা পেয়েছিলেন। তাঁর মানসগঠনে শান্তিনিকেতন ছিল, বাবার অন্যতর কথাসাহিত্য ছিল, স্বামীর খ্যাপাটে কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ ছিল, সর্বোপরি ছিল নিজের জীবন সংগ্রামের শিক্ষা। অতি রাজনীতি সচেতনতা তাঁকে অকুতোভয় করেছিল। তাঁর যাপিতজীবন ছিল বিস্ময়কর রকমের অনাড়ম্বর। তাঁর লেখার সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে। বাংলাদেশের জনপ্রিয় সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*র ঈদ সংখ্যায় তাঁর একটি উপন্যাস মুদ্রিত হয় *চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর* নামে। *বিচিত্রা* কর্তৃপক্ষ জানিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের কোন পত্রিকা তাঁর উপন্যাসটি ছাপতে রাজি হচ্ছিলেন না বলে তিনি বাংলাদেশে মুদ্রণের জন্য পাঠিয়েছিলেন। রাজনীতি যে এর নেপথ্যে কারণ, তা না বললেও চলে। তিনি কখনো মন জুগিয়ে, কারো মন রাখতে কলম ধরেননি। তিনি ছিলেন প্রথা বিরোধী– ক্ষমতাসীনদের চিরকালের বিরোধীপক্ষ। নিজে যা বুঝেছেন, সত্য বলে মেনেছেন, তার নির্যাস পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করেছেন। ক্রমে তিনি হয়ে উঠেছিলেন দেশ ও জনগণের বিবেক। ২০১৬ সালের জুলাই মাস বিশিষ্ট হয়ে রইল তাঁর মৃত্যুর তারিখ বুকে নিয়ে। তাঁর সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলবার ছিল বলে তিনি লিখতেন। অকারণে এলেবেলে যা-তা লিখে বাজার গরম করা তাঁর অভ্যাসে ছিল না। তাঁর *হাজার চুরাশির মা*– নকশাল আন্দোলনের দলিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, সত্যিকারের ইতিহাস সাধারণ মানুষের দ্বারা রচিত হয়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সাধারণ মানুষ যে লোককথা, লোকগীতি, উপকথা ও কিংবদন্তিগুলি বিভিন্ন আকারে বহন করে চলেছে, তার পুনরাবির্ভাবের সঙ্গে তিনি ক্রমাগত পরিচিত হবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলতেন, 'আমার লেখার কারণ ও অনুপ্রেরণা হল সেই মানুষগুলি যাদের পদদলিত করা হয় ও ব্যবহার করা হয়, অথচ যারা হার মানে না। আমার কাছে লেখার উপাদানের অফুরন্ত উৎসটি হল এই আশ্চর্য মহৎ ব্যক্তিরা, এই অত্যাচারিত মানুষগুলি। যখন আমি তাদের জানতে শুরু করেছি, অন্য কোথাও আমি কাঁচামালের সন্ধান করতে যাব কেন? মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার লেখাগুলি আসলে তাদেরই লেখা।...'

দিনপঞ্জির তালিকায় দেখছি, ১৮৮৮ সালের ৫ সেপ্টেম্বর ধরাধামে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ভারতের বিশিষ্ট দার্শনিক ড. সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণ। তাঁকে শিক্ষিত সমাজ একজন দর্শনপ্রেমিক হিসেবে মনে রেখেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে জানে। তিনি তাঁর অসংখ্য শিক্ষামূলক বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ভারতের অন্যতম শিক্ষাবিদ হিসেবে আজও সম্মানিত। তাঁর বিখ্যাত বইগুলির মূল্যবান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁকে অমর করে রাখবে। সমকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করতেন, বিশ্বে শান্তি স্থাপন, যুদ্ধরোধ, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়ন সাধনের ভিত্তিভূমি হল সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। জাতিসংঘে দেওয়া তাঁর মানব প্রেমের বাণী, বিশ্বশান্তির বাণী এবং 'One World' বা বিশ্বরাষ্ট্রের আন্তরিক আবেদন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

ঢাকায় ভারতীয় শিক্ষা মেলা

২৯ জুলাই ২০১৬ ঢাকার ফার্মগেটের *ডেইলি স্টার* কনভেনশন সেন্টারে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা 'তৃতীয় ভারতীয় শিক্ষা মেলা ২০১৬'-র উদ্বোধন করেন। ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের সহায়তায় এ অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় শিক্ষা মেলার আয়োজনকারী প্রতিষ্ঠান এসএপিই এবং মিডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ২৯-৩০ জুলাই ঢাকায় এবং ১-২ আগস্ট চট্টগ্রামে এ মেলার আয়োজন করে। এসএপিই ইতোপূর্বে বাংলাদেশ ছাড়াও ভূটান, নেপাল, মায়ানমার, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ায় সাফল্যের সঙ্গে অনুরূপ শিক্ষা মেলার আয়োজন করেছে।

বাংলাদেশী শিক্ষার্থীদের দোরগোড়ায় শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগ পৌঁছে দেওয়াই এ মেলার লক্ষ্য। সারা ভারতের স্কুল, কলেজ ও কারিগরি প্রতিষ্ঠানসহ ৩০টির বেশি প্রথম সারির শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ মেলায় অংশ নেয়। শিক্ষার্থী ও সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক ছাদের নীচে আনা ছাড়াও এই মেলা সম্ভাব্য পছন্দের ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশনাসহ অংশগ্রহণকারী ভারতীয় প্রতিষ্ঠান ও স্কুলসমূহে সুযোগ-সুবিধা ও খরচ সম্পর্কে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ করে দিয়েছে। এটা প্রত্যেকের চাহিদা অনুযায়ী পছন্দমত তুলনা করে সিদ্ধান্ত নিতেও সাহায্য করে।

শিক্ষা মেলায় বিনামূল্যে প্রবেশ এবং পরামর্শ ছাড়াও শিক্ষার্থীরা বিনামূল্যে কেরিয়ার এপটিচুড টেস্ট (যথাযথ কেরিয়ার নির্বাচন পরীক্ষা)-এরও সুযোগ পান। এ পরীক্ষা আড়াইশোর বেশি শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন ও মানচিত্র এবং ছাত্রদের পছন্দের বৃত্তিমূলক ক্ষেত্র নির্ধারণে সাহায্য করে। পরীক্ষার রিপোর্টে শিক্ষার্থীদের মানচিত্র, পছন্দের বৃত্তি এবং পাঠ্যক্রম পরামর্শও অন্তর্ভুক্ত ছিল। শিক্ষার্থীরা একে বৃত্তি ও তাৎক্ষণিক ভর্তির মঞ্চ হিসেবেও ব্যবহার করেন।

মেলা উপলক্ষে দেওয়া এক বার্তায় ভারতীয় হাই কমিশনার বলেন, বাংলাদেশ একটি আধুনিক অর্থনীতি সৃজনের লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে চলছে এবং ভারত এই প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির ঘনিষ্ঠ অংশীদার হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এক্ষেত্রে শিক্ষা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায়। শিক্ষাখাতে বাংলাদেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার ভারতের ইচ্ছা তুলে ধরে হাই কমিশনার আশা প্রকাশ করেন যে, এই মেলা ভারতের শিক্ষার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে এবং উচ্চ মানের শিক্ষার সুযোগের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের তরুণদের একে-অপরের কাছাকাছি আসার একটি মঞ্চ হিসেবে কাজ করবে। তিনি এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং মেলার সাফল্য কামনা করেন। ●

০৯ আগস্ট ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সঙ্গে তাঁর গুলশান কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। হাই কমিশনার দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্পর্কে বিএনপি চেয়ারপারসনকে অবহিত করেন। তিনি বলেন, দুই দেশের জনগণের পারস্পরিক উপকার এবং এতদঞ্চলের সমন্বিত সমৃদ্ধির জন্য সার্বভৌমত্ব, সমতা, বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও সমঝোতার উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মত পরিণত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারত বাংলাদেশের অংশীদার হতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রেক্ষিতে হাই কমিশনার দু'দেশের জনগণের মধ্যে আরও যোগাযোগসহ দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক বন্ধন জোরদার করতে সংযোগ বৃদ্ধি ও অবকাঠামোর উন্নয়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন

৩১ জুলাই ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে জাতীয় পার্টির সংসদীয় প্রতিনিধিদের বৈঠকে বিরোধী দলীয় নেত্রী মিসেস রওশন এরশাদ উপস্থিত ছিলেন

০৩ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ভারত-বাংলাদেশ পারস্পরিক শিক্ষাবিষয়ক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা হয়

অঞ্জয়রঞ্জনকে অভিনন্দন

হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে হিন্দি বৃত্তিপ্রাপ্ত অঞ্জয়রঞ্জন দাসকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

এই প্রথমবারের মত, আইজিসিসি-র দু'জন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী অঞ্জয়রঞ্জন দাস ও নার্গিস সুলতানা 'বিদেশে হিন্দি প্রসার' স্কিমের আওতায় আগ্রার কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান (সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ হিন্দি)-এ হিন্দি ভাষায় ডিপ্লোমা করার বৃত্তি লাভ করলেন।

ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়াধীন আগ্রার কেন্দ্রীয় হিন্দি সংস্থান এ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

মিস নার্গিস সুলতানা বাংলাদেশ বেতারের হিন্দি সংবাদ পাঠিকা। ২০১১ সালে তিনি হিন্দি শিখতে শুরু করেন। অঞ্জয়রঞ্জন দাসের হিন্দি শিক্ষার শুরু ২০১৩ সালে। তিনি ভূপালে গতবছরের সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব হিন্দি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

● নিজস্ব প্রতিনিধি

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি

আকাশবাণী মৈত্রী দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠবে

২৩ আগস্ট ২০১৬ মহামান্য রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় কলকাতায় *আকাশবাণী মৈত্রী* নামে একটি বাংলা বেতার সার্ভিসের উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষ্যে বক্তৃতাকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, *আকাশবাণী মৈত্রী* ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে উঠবে।

২০১৫ সালের জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে উভয় দেশের অভিন্ন বিষয়সংবলিত একটি রেডিও চ্যানেল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। নতুন বেতার চ্যানেলটি ভারত ও বাংলাদেশের বাংলাভাষী জনগণের মধ্যে সংবাদ বিনোদন তথ্য সম্প্রচার শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের চিন্সুরাহ্য় একটি স্টেট-অফ-দি-আর্ট ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছে যাতে বাংলাদেশের সব জায়গা থেকে সার্ভিসটি সম্প্রচারিত হতে পারে। সার্ভিসটি ভারতে ও বাংলাদেশে ৫৯৬ কিলোহার্টসে সম্প্রচারিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় স্পিকার পৃথক পৃথক বার্তায় *আকাশবাণী মৈত্রী* নামের নতুন বেতার চ্যানেল প্রতিষ্ঠায় স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, চ্যানেলটি দুই দেশের মধ্যে মৈত্রীর বন্ধনে একটি সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করবে। •

প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বিশেষ ভারতীয় ভিসা সার্ভিস

ভারত সরকার সাম্প্রতিক ঘোষণা অনুযায়ী ৬৫ বছরের অধিক বয়সী বাংলাদেশী নাগরিকগণ এখন থেকে দীর্ঘমেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসা প্রাপ্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, যার মেয়াদ হবে পাঁচ বছর। প্রতিবার মাল্টিপল এন্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসায় ভ্রমণকালে কোন অবস্থাতেই টানা ৯০ দিনের বেশি অবস্থান করা যাবে না। প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ভারত সরকারের এ শুভেচ্ছা-উদ্যোগে ভারতীয় ভিসা সংগ্রহ সহজ হবে এবং উভয় দেশের মধ্যে মানুষে-মানুষে সংযোগ ও সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। গাজীপুরের ৬৮ বছর বয়সী মো. নূরুল হক আখন্দ প্রথম পাঁচ-বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসা লাভ করেন। তিনি হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার হাত থেকে তাঁর পাঁচ-বছর মেয়াদী মাল্টিপল এন্ট্রি ট্যুরিস্ট ভিসাটি গ্রহণ করেছেন। •

০৮ আগস্ট ২০১৬ মেট্রোপলিটন চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই)-র তৃতীয় ত্রৈমাসিক মধ্যাহ্নভোজ বৈঠকে হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বক্তৃতা করেন।

এমসিসিআই এই দেশের প্রাচীনতম ব্যবসা চেম্বার্স। এর অগ্রদূত ঢাকা-নারায়নগঞ্জ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ১৯০৪ সালে গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ চেম্বার এমসিসিআই হিসেবে নামকরণ করা হয় এবং এর সদর দপ্তর ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়।

ঢাকা-দিল্লি পরীক্ষামূলক যান চলাচল শুরু

২৭ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশ-ভূটান-ভারত-নেপাল (বিবিআইএন) মোটর যান চুক্তি (এমভিএ)-র আওতায় একটি কার্গো যান পরীক্ষামূলকভাবে ঢাকা থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হয়। তৈরি পোশাক নিয়ে কার্গো যানটি বেনাপোল-পেট্রাপোল-কলকাতা ও লক্ষ্ণৌ হয়ে দিল্লি যায়। এটি ২৮ আগস্ট কলকাতা হয়ে ১ সেপ্টেম্বর দিল্লি পৌঁছয়। কার্গো যানটি ৩০ আগস্ট কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয়।

বিবিআইএন এমভিএ-র আওতায় প্রস্তাবিত কার্গো ও যাত্রী চলাচল নিয়মিত করার ক্ষেত্রে এই পরীক্ষামূলক যাত্রা থেকে সংগৃহীত যাত্রাপথ ও উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে চালক ও পরিবহনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ বাস্তব বিষয়াদি অনুধাবনে সক্ষম হবেন।

বিবিআইএন মোটর যান চুক্তিটি ২০১৫ সালের জুন মাসে ভূটানের থিম্পুতে বিবিআইএন পরিবহনমন্ত্রীদের বৈঠকে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। •

কলকাতা-খুলনা বাস সার্ভিস

৩০ আগস্ট দুপুর ১২.৩০ মিনিটে কলকাতা থেকে কলকাতা-খুলনা বাস সার্ভিসের পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু হয় এবং ঐদিন সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে খুলনায় পৌঁছয়। বাস সার্ভিসের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের পরিবহনমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী। •

জয়াগে গান্ধী আশ্রমে হাই কমিশনার

৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা নোয়াখালী গান্ধী আশ্রম পরিদর্শন করেন। বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরও আশ্রম পরিদর্শন করেন। নোয়াখালীর জয়াগে পৌঁছলে জেলা প্রশাসন ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ মন্ত্রী ও হাই কমিশনারকে স্বাগত জানান। এসময় চট্টগ্রামে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার শ্রী সোমনাথ হালদারও উপস্থিত ছিলেন।

হাই কমিশনার ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী একত্রে গান্ধী আশ্রম পরিদর্শন করেন এবং আশ্রম আঙ্গিনায় নবনির্মিত গান্ধী মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন করেন। স্কুল ভবনটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের গান্ধী হেরিটেজ সাইটস্ মিশন-এর অর্থায়নে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্ট উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ হিসেবে নির্মিত হয়েছে। এ উন্নয়ন প্রকল্পে খরচ হয় ৬.৮৪ কোটি টাকা। আশ্রমের জাদুঘর ও গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সচিবের অফিস ও বাসভবনের মানোন্নয়নও এ উন্নয়ন প্রকল্পের অংশ ছিল।

আশ্রমে স্কুল ভবনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে হাই কমিশনার গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের উন্নয়ন ও সেবাকাজের প্রশংসা করেন। তিনি এলাকার গ্রাম উন্নয়নকাজে গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের বিপুল অবদানের কথা স্মরণ করে সমাজের সকল শ্রেণীর উপকারে ট্রাস্টকে কাজ অব্যহত রাখার এবং গান্ধীজীর অহিংসা, শান্তি, সহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাণী ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সভাপতি দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, গান্ধী আশ্রম ট্রাস্টের সচিব পদ্মশ্রী ঝর্নাধারা চৌধুরী এবং অন্যান্যের মধ্যে ট্রাস্ট সদস্য সিলেট জেলা আদালতের রাষ্ট্রপক্ষের কৌশলী মো. মেসবাহউদ্দিন সিরাজ এবং নোয়াখালী জেলা প্রশাসক মুনীর ফিরদৌস।

হাই কমিশনার ঝর্নাধারা চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ট্রাস্টের জন্য তাঁর অবদান, দৃষ্টিভঙ্গী ও নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। হাই কমিশনার মানুষের উন্নতিকল্পে এবং সমাজে গান্ধীজীর বাণী ছড়িয়ে দিতে তাঁর উৎসাহব্যঞ্জক কাজ অব্যাহত রাখার জন্য ঝর্নাধারা চৌধুরীর সুস্বাস্থ্য কামনা করেন। •

ত্রয়োদশ টেক্সটেক বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক এক্সপো, পঁচিশতম ডাই+কেম এক্সপো এবং দশম ঢাকা আন্তর্জাতিক সুতা ও বয়ন প্রদর্শনী ২০১৬-য় বক্তব্য রাখছেন ডেপুটি হাইকমিশনার ড. আদর্শ সোয়াইকা। ভারতের এসোসিয়েটেড শিল্প ও বণিক সমিতি, কটন টেক্সটাইল এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল এবং বেসিক কেমিক্যালস, কসমেটিকস এন্ড ডাইস এক্সপোর্ট প্রোমোশন কাউন্সিল আয়োজিত এ প্রদর্শনীটি ৩১ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর ২০১৬ পর্যন্ত চলে।

সারদা পুলিশ একাডেমিতে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ভবন নির্মাণে চুক্তি স্বাক্ষর

রাজশাহীর সারদায় অবস্থিত বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমিতে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ২৮ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এবং বাংলাদেশের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিব মোহাম্মদ মেজবাহউদ্দিন একটি আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ভবনটিতে গবেষণাগার, প্রতিরূপ অপরাধচিত্রসমূহ এবং একটি নমুনা অপরাধ স্টেশন থাকবে। এছাড়া, এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি কম্পিউটার ল্যাবসহ একটি তথ্যপ্রযুক্তি কেন্দ্র, প্রত্যক্ষীকরণ (ভিজুয়ালাইজেশন) প্রযুক্তিসংবলিত কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ, তথ্যভাণ্ডার, একাডেমি তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা পদ্ধতি এবং অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্কিং সুবিধা এই পুলিশ একাডেমিতে থাকবে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, ৬ জুন ২০১৫ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যৌথভাবে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন।

প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ১০.৮৬ কোটি টাকা ধরা হয়েছে যার পুরোটাই ভারত সরকার অনুদান হিসেবে প্রদান করবে।

• নিজস্ব প্রতিবেদন

শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহাশ্বেতা দেবী ১৯২৬-২০১৬

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়

মহাশ্বেতা দেবী প্রয়াত হলেন ২৮ জুলাই ২০১৬ দুপুর তিনটে নাগাদ। ১৯২৬-এ জন্ম তাঁর। সেই হিসেবে অকাল প্রয়াণ বলা যাবে না অবশ্যই। তবে আমাদের এই উপমহাদেশে তাঁর মত এক বরেণ্য লেখকের মৃত্যু নিঃসন্দেহে বেদনার। বাংলা সাহিত্য তাঁর অভাব বোধ করবে। রবীন্দ্রনাথ বা সত্যজিৎ রায়ের যেমন বংশ পরম্পরাগত ঐতিহ্য বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতে, মহাশ্বেতা দেবীরও তাই। এই ঐতিহ্য ও পরম্পরার সূচনা মহাশ্বেতার মাতৃবংশে জাত যাদব চক্রবর্তীকে দিয়ে।

মহাশ্বেতার প্রমাতামহ যাদবচন্দ্র ছিলেন পাবনা জেলার লোক, কোচবিহার মহারাজের দেওয়ান। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

শান্তিনিকেতন-পর্ব মহাশ্বেতাকে নির্মিতি দিয়েছে বহুল পরিমাণে। একে তো মাথার ওপরে জাজ্বল্যমান রবীন্দ্রনাথ আর তার ওপর ওখানকার যে মনীষীসমাবেশ– তেজেশচন্দ্র সেন, হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, কৃষ্ণ কৃপালনী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজ, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, সরলা দেবী, এই অভাবিত নক্ষত্রসন্নিবেশ তাঁকে গড়ে তুলেছে।

ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল এবং সেই সুবাদে তিনি ব্রাহ্ম হতেও গিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন। যাদবচন্দ্র ছিলেন গ্রন্থকর্তা ও চিত্রশিল্পী। রাজা রামমোহন রায়ের প্রথম জীবনী রচয়িতা তিনি। সিংহল ও মায়ানমার (সাবেক বর্মা) বেড়াতে গিয়ে সে-সব জায়গার মন্দির ও প্যাগোডার স্কেচ করে এনেছিলেন।

কবি অমিয় চক্রবর্তী ছিলেন যাদবচন্দ্রেরই পৌত্র। মহাশ্বেতা দেবীর দিদিমা কিরণময়ী দেবীও লেখিকা ছিলেন। *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*-এর ঢাকা শাখার সম্পাদক ছিলেন তিনি। পরিষদের পত্রিকা *প্রতিভাতে* তাঁর লেখা প্রকাশিত হত। মহাশ্বেতার এক মামা শচীন চৌধুরী *ইকনমিক এ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি* নামে মুম্বইয়ের বিখ্যাত পত্রিকাটির সম্পাদক এবং হিমাংশু রায়ের মৃত্যুর পর মুম্বইয়ে হিমাংশু-প্রতিষ্ঠিত *বম্বে টকিজ*-এর পরিচালক ছিলেন। অন্য মামা শঙ্খ চৌধুরী প্রখ্যাত ভাস্কর।

এই গেল মাতৃকুল। পিতৃকুলে বিখ্যাততম হলেন ঋত্বিককুমার ঘটক, মহাশ্বেতার প্রায়-সমবয়সী কাকা। মহাশ্বেতার পিতামহ সুরেশচন্দ্র ঘটক ইংরেজি, সংস্কৃত ও ইতিহাস এই তিনটি বিষয়ে এম এ! এর পুত্রদের মধ্যে মহাশ্বেতার পিতা মনীষ ঘটক ছিলেন কবি ও প্রাবন্ধিক। *কল্লোল*যুগের অন্যতম স্বনামধন্য লেখক, যাঁর *পটলভাঙ্গার পাঁচালী* বহুচর্চিত গ্রন্থ। *মান্ধাতার বাবার আমল* নামে আত্মজীবনীও রয়েছে তাঁর। মহাশ্বেতার মা ধরিত্রী দেবীও লেখালেখি করতেন। তাঁর লেখা 'নারী' কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের প্রশংসা অর্জন করে। এটি *জয়শ্রী*তে বেরিয়েছিল। *পরিচয়* পত্রিকায় তাঁর গল্পও ছাপা হয়। *মাসিক বসুমতী*তে বেরোয় পার্ল এস বাক রচিত গল্পের অনুবাদ। তাছাড়া হাতে-লেখা একটি পারিবারিক পত্রিকা ছিল তাঁদের, নাম *ফসল*।

পরিবারে খ্যাতনামাদের মধ্যে আরেকজন হলেন মনীষের অন্য এক ভাই সুধীশচন্দ্র ঘটক, যিনি বিমল রায়ের সঙ্গে বিলেত গিয়ে সিনেমা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে এসে নিউ থিয়েটার্স-এ যুক্ত হন। বহু ছবির ক্যামেরাম্যান তিনি, যেমন কানন দেবী-সায়গলের *স্ট্রিট সিঙ্গার*। কয়েকটি সিনেমার পরিচালকও ছিলেন ঋত্বিক-অগ্রজ সুধীশচন্দ্র। *রাধারানী* (১৯৫০), *দ্বৈরথ* (১৯৫১), *পঞ্চায়েত* (১৯৫১) সুধীশ-পরিচালিত চলচ্চিত্র।

এমন এক ঐতিহ্যিক পরিবারে মনীশ-ধরিত্রীর পাঁচ মেয়ে ও চার ছেলের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ হয়ে মহাশ্বেতার জন্ম। বাবা ছিলেন প্রেসিডেন্সির কৃতী ছাত্র। মেয়েকে প্রথমে ঢাকার ইডেন মান্টেসরিতে ভর্তি করেন। বাবা চাকরি করতেন সরকারি রাজস্ব বিভাগে। বদলির চাকরি। তাই মহাশ্বেতা এরপর মেদিনীপুরের স্কুলে পড়েন। তারপর পিতার ইচ্ছায় শান্তিনিকেতন। ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮ প্রথম দফায় এই যে তিন বছর সেখানে পাঠভবনে পড়াশুনো, তা তাঁকে এক গভীর জীবনবোধ অর্জনে সহায়তা করে। আমাদের একটু আশ্চর্যই লাগে, যে মনীষ ঘটক (ছদ্মনাম যুবনাশ্ব) ছিলেন *কল্লোল*গোষ্ঠীর লেখক এবং যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করে সাহিত্যে আধুনিকতা আনতে চান তিনিই কিনা আত্মজাকে ভর্তি করালেন শান্তিনিকেতনে, বিশাল এক পরিবারের অর্থকৃচ্ছতা সত্ত্বেও! আর তা ঠিক এমন এক সময়ে, যখন *কল্লোল* রীতিমত জয়ধ্বজা ওড়াচ্ছে তাঁর!

এই শান্তিনিকেতন-পর্ব মহাশ্বেতাকে নির্মিতি দিয়েছে বহুল পরিমাণে। একে তো মাথার ওপরে জাজ্বল্যমান রবীন্দ্রনাথ আর তার ওপর ওখানকার যে মনীষীসমাবেশ– তেজেশচন্দ্র সেন, হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদী, কৃষ্ণ কৃপালনী, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, রামকিঙ্কর বেইজ, দীনবন্ধু এন্ড্রুজ, সরলা দেবী, এই অভাবিত নক্ষত্রসন্নিবেশ তাঁকে গড়ে তুলেছে। দৈনন্দিন পঠন-পাঠনের বাইরে প্রকৃতিকে চেনা, দেশবিদেশের ছাত্র-ছাত্রীদের উষ্ণ সান্নিধ্য, আকাশ-বাতাসমুখরিত সঙ্গীতের আবহ, খেলাধুলোর প্রসন্ন পরিবেশ, মাঝে মাঝেই খোয়াই দর্শন, সেই 'সব পেয়েছির দেশ' সম্পর্কে মহাশ্বেতার মন্তব্য, 'আমি ওই তিন বছরে অনেক পেয়েছি। সেদিনের শান্তিনিকেতনের কাজই ছিল, শৈশব থেকে মনের অজস্র চোখ ও দরজা খুলে দেওয়া।' পিতার আর্থিক কারণেই হয়তো তাঁকে তিন বছর বাদে ওখান থেকে চলে এসে কলকাতার বেলতলা গার্লস-এ ভর্তি হতে হয়। ম্যাট্রিক পাশ করেন ওখান থেকেই। পরে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হলেও তৃতীয় বর্ষে আবার শান্তিনিকেতন এবং সেখান থেকেই '৪৬-এ বি এ ডিগ্রি আর্জন। এম এ-তে ভর্তি হলেন এমন এক ক্রান্তিকালে, '৪৬-এর দাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দিল না তাঁকে, মামা বাড়ি ল্যান্সডাউন রোডে থেকে প্রত্যক্ষ করেন দাঙ্গার বীভৎসতা, দেখেন ডাবলডেকার বাস-ভর্তি মৃত ও আহত লোকের শরীর। বহু পরে ১৯৬৩-তে প্রাইভেটে এম এ পাস করেছিলেন তিনি ইংরেজি সাহিত্যে। ১৯৪৭-এর ২০ অক্টোবর বিয়ে হয় মহাশ্বেতার, আরেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব নাট্যকার নাট্য পরিচালক মঞ্চ ও চলচ্চিত্রাভিনেতা বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে। ১৯৪৮-এর ২৩ জুন (পলাশীর যুদ্ধের তারিখ) জন্ম হয় তাদের একমাত্র পুত্র নবারুণের।

মহাশ্বেতা লিখতে শুরু করলেন কীভাবে ও কবে থেকে? স্বামী বিজন ভট্টাচার্য ছিলেন কমিউনিস্ট। স্বাধীনতার পরপরই ১৯৪৮ থেকে পার্টি নিষিদ্ধ ফলে বিজনকে প্রায়ই চলে যেতে হয় আন্ডারগ্রাউন্ডে। এর মধ্যেই বিজন *গণনাট্য সংঘের* হয়ে নাটক করছেন, লিখছেনও, *আগুন*, *জবানবন্দী*, *নবান্ন*। সংসারের দায়িত্ব নিয়ে মহাশ্বেতা আজ এ চাকরি, কাল ও চাকরি। *মেঘে ঢাকা তারা* মূর্ত হয়ে উঠেছিল মহাশ্বেতার জীবনে, মায় তাঁর টিবিতে আক্রান্ত হওয়ার বাস্তবতাসমেত। তবে নীতার মত তাঁকে মরতে হয়নি। স্বামী পার্টি করতেন বলে কেন্দ্রীয় সরকারের ১৪০ টাকা মাইনের চাকরিটি খোয়াতে হয়েছিল তাঁকে, এইমাত্র। তখন টিউশন ভরসা।

এর মধ্যে সহসা ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবনী তাঁকে আকৃষ্ট করল। এই চরিত্রটির গভীরে ডুব দিতে দিতে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়ে এতদ্‌সংক্রান্ত বইপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে তাঁর সংকল্পে থিতু হলেন তিনি, এই রানীকে নিয়ে লিখবেন তিনি। প্রাথমিকভাবে লিখেও ফেললেন চারশো পৃষ্ঠা। স্বস্তি পেলেন না লিখে। ছিঁড়ে ফেললেন সে-লেখা আর ঝাঁসি গিয়ে রানীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটটি হৃদ্গত করে নিয়ে লিখবার জেদ তাঁকে সেখানে নিয়ে ছাড়ল। তারই ফলশ্রুতি *ঝাঁসির রানী* রচনা, *দেশ* পত্রিকায় ১৯৫৫ সাল জুড়ে ধারাবাহিকভাবে তা ছাপলেন সাগরময় ঘোষ। সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সহ-সম্পাদক তিনি। ইতিহাসবিদ প্রতুলচন্দ্র রায় তাঁর বন্ধু। প্রতুলচন্দ্রের সুপারিশেই সে-লেখা ছাপা হয়েছিল *দেশ*-এ। তাছাড়া তিনি একদিকে বহু গ্রন্থ পড়তে দিয়ে, গ্রন্থের তালিকা দিয়ে যেমন সাহায্য করেছিলেন মহাশ্বেতাকে, তেমনি ১৯৫৩-তে আহমেদাবাদে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসে মহাশ্বেতার যোগদানের ব্যবস্থা করে গ্রন্থ রচনায় প্রভূত সাহায্য করেন।

সে বড় সুখের সময় *দেশ*-এর, বাংলা সাহিত্যের। বিমল কর ও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক উপন্যাসের পরেই মহাশ্বেতা! তার পাশাপাশি ধারাবাহিকভাবেই ধীরাজ ভট্টাচার্য লিখছেন *যখন নায়ক ছিলাম*, বেরোচ্ছে সমরেশ বসুর গল্প, বিজ্ঞাপিত হচ্ছে *বহুরূপী*র রবীন্দ্রনাটক *রক্তকরবী*, সাবিত্রী রায়ের *পাকা ধানের গান* আর লীলা মজুমদারের *মণিকুন্তলা*র আবির্ভাব হচ্ছে, উপন্যাস লিখছেন আরো এক নারী আশা

তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে ভারতের আদিবাসী সমাজের এক বিরাট অংশ তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার নিয়ে প্রামাণ্য ও মহত্ত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। অরণ্যের অধিকার, চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর, কৈবর্তখণ্ড ইত্যাদি উপন্যাস এবং তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে আদিবাসী মানুষের স্বেদ রক্ত হাহাকার ও সহজ আদিম জীবনযাপনের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়ে আছে।

দেবী, যাঁর গ্রন্থটি (*মেঘলা প্রহর*) ঐ সময়েই সমালোচিত হতে দেখি *দেশ*-এ। সাহিত্যে এই যে মেয়েরা স্থান করে নিচ্ছেন স্বাধীনতার এক দশকের মধ্যেই প্রবলভাবে, খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এর বার্তা। শুধু গদ্য রচনাতেই, বা কেবল সাহিত্য রচনাতেই নয়, সময়টিকে আমরা স্বাধীনতা-পরবর্তী নারী-জয়যাত্রার সূচনালগ্ন হিসেবেও ধরতে পারি। নাটকে তৃপ্তি মিত্র, চলচ্চিত্রে সুচিত্রা সেন আলো ছড়াচ্ছেন। *দেশ*-এই তো দেখছি জগন্নাথ চক্রবর্তী, শামসুর রাহমান, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত যেমন, তেমনি কবিতা লিখছেন আরতি দাস। এই শুভলগ্নেই ৩০ জুলাই ১৯৫৫-য় *দেশ* পত্রিকাতেই বিজ্ঞাপন বেরোল, '১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা।... রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন তার অন্যতমা সংগ্রামী। ১৮৫৭ সালের ৪ঠা জুন থেকে ১৮৫৮ সালের ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত ঝাঁসিতে ব্রিটিশরাজের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ তিনি করেছিলেন, অবশেষে ১৭ই জুন অবিচ্ছেদ্য ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের পর গোয়ালিয়রের রণক্ষেত্রে তাঁকে প্রাণ হারাতে হয়।

'সারা ভারতে সিপাহী বিদ্রোহের শতবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ-আয়োজন শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য কর্তৃক লিখিত বীরশ্রেষ্ঠা ভারতীয় নারী লক্ষ্মীবাঈয়ের বহু নূতন তথ্য সংবলিত জীবনালেখ্য 'ঝাঁসীর রানী' আগামী সপ্তাহ থেকে *দেশ* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে।'

এমন কিন্তু নয় যে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি শুরু হয় এ লেখাটির মাধ্যমে। এর আগে *দেশ* পত্রিকাতেই তাঁর দু-তিনটে ছোটগল্প বেরিয়েছিল। জিম করবেট, যাঁকে তিনি পরবর্তীকালে অনুবাদ করবেন, ছিল তাঁর প্রবন্ধের বিষয়, ওখানেই।

তাছাড়া মহাশ্বেতার লেখক সত্তার উন্মেষকাল তো শৈশবেই, শান্তিনিকেতন পর্বে। সেখানে সে সাহিত্যসভা হত নিয়মিত, সরলা দেবী চৌধুরানী সভাপতিত্ব করতেন, দশ-বারো বছরের মহাশ্বেতা লেখা পড়তেন সেখানে, যা ছাপাও হয়েছিল। সেই বয়সে আলফ্রেড নোবেলকে নিয়ে মহাশ্বেতা প্রবন্ধ লিখছেন, ভাবা যায়? পরবর্তীকালে খগেন্দ্রনাথ সেনের *রংমশাল* পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের *ছেলেবেলা* বইয়ের আলোচনা করেন যখন, তখন তাঁর বয়স মাত্রই তেরো (১৯৩৯)। হাতে-লেখা পত্রিকা বার করাও বাদ যায়নি, বয়সে তিন মাসের ছোট ঋত্বিক যে-কাজে তাঁর সহযোগী। পত্রিকায় ছবি আঁকার দায়িত্ব ছিল ঋত্বিকের। রাজলক্ষ্মী দেবী ছিলেন বেলতলা স্কুলে মহাশ্বেতার সহপাঠিনী, এম এ ক্লাসেরও। স্কুলে পড়ার সময় তাঁরা আরেকবার হাতে-লেখা পত্রিকা বার করলেন, নাম *ছন্দ-ছড়া*।

দ্বিতীয়বারের শান্তিনিকেতন-পর্বে তাঁর গল্প লেখার সূচনা। *দেশ*, *সচিত্র ভারত* পত্রিকাসহ আরো নানা পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন এ-সময়ে, পাঁচের দশকের গোড়া থেকে।

দুই.

দীর্ঘ প্রায় সাত সাতটি দশকজুড়ে মহাশ্বেতা দেবী অনলস লিখে গেছেন। রচনা সম্ভারের বিপুলতা এবং বৈচিত্র্য, উভয় দিক থেকেই বিস্ময় জাগে তাঁর রচনাবলীর দিকে তাকালে। উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ, অনুবাদ ছাড়াও ছাত্রপাঠ্য বহু বই লিখতে হয়েছে তাঁকে। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি থেকে লেখাকেই পেশা করে নেন তিনি, যাকে বলে প্রফেশনাল রাইটার। সমরেশ বসু ছাড়া বাংলা সাহিত্যে একমাত্র মাহশ্বেতা দেবীকেই এই অভিধা দেওয়া হয় এবং সম্ভবত পরবর্তীকালে কিন্নর রায়কে। মাঝে অল্প কয়েক বছরের জন্য তিনি বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজে ইংরেজির অধ্যাপিকা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। আবার ছেড়েও দিয়েছেন সে-চাকরি, পূর্ণ সময়ের লেখক হওয়ার জন্য। একে নিতান্ত দুঃসাহস ছাড়া আর কী-ই বা বলা যাবে, যখন বাংলাভাষায় লিখে নিয়মিত উপার্জন করা ছিল অলীক স্বপ্ন!

লেখার পাশাপাশি তাঁর অন্যতর পরিচয় আছে সমাজকর্মী হিসেবে এবং তা কোন সৌখিন পদচারণা ছিল না। বাংলা-বিহার-ওড়িশার প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আদিবাসীর মধ্যে কাজ করে গেছেন তিনি আজীবন। জঙ্গলমহলের খেড়িয়া, শবর, লোধাদের সামাজিক অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে সামিল হয়েছিলেন তিনি। এই জনজাতিকে জমির পাট্টা দিতে তাঁর নেতৃত্বদানের জন্য তিনি সেখানে মায়ের মত সম্মান পান। শবর জাতির ওপর ঔপনিবেশিক শোষণ ছিল সীমাহীন উপরন্তু ব্রিটিশরা এদের আখ্যা দেয় 'অপরাধপ্রবণ' জাতি হিসেবে। মহাশ্বেতা তাঁদের সেই দুর্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে দেখান, তাঁদের প্রাচীন সংস্কৃতি কী মহান। একদিকে তিনি তাদের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের অর্থনৈতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে গিয়েছেন, অন্যদিকে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে ভারতের আদিবাসী সমাজের এক বিরাট অংশ তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য-উত্তরাধিকার নিয়ে প্রামাণ্য ও মহত্ত্বের সঙ্গে উঠে এসেছে। *অরণ্যের অধিকার*, *চোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর*, *কৈবর্তখণ্ড* ইত্যাদি উপন্যাস এবং তাঁর অসংখ্য ছোটগল্পে আদিবাসী মানুষের স্বেদ রক্ত হাহাকার ও সহজ আদিম জীবনযাপনের রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়ে আছে। আদিবাসীদের জীবনের গভীরে গিয়ে তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া, তাদের লোকাচার এবং ইতিহাসের পরম্পরাকে শ্রদ্ধাসহকারে অনুধাবনের চেষ্টা আর কোন বাঙালি লেখকের মধ্যে দেখা যায়নি। বাংলা সাহিত্যের ভূগোলকে বিস্তৃতি দিয়েছেন তিনি, আদিবাসী সমাজের সঙ্গে আমাদের নৈকট্য এনে দিয়েছেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *পালামৌ* আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের *অরণ্যের দিনরাত্রি* আদিবাসীদের বহিরঙ্গটুকু দেখায় মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত সময় লেগেছিল অভিজাত উচ্চবিত্ত থেকে উপন্যাসে মধ্যবিত্তের কথাকলি নির্মিত হতে। আর সেখান থেকে আদিবাসী সমাজে আসতে লেগে গেল আরো বহু বছর। বাংলা সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা এখানেই যে, কেবল আদিবাসী সমাজ-ই নয়, দলিত সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প-উপন্যাসেরও বড় দৈন্য, দৈন্য মুসলমান সমাজের প্রতিফলনেও। তাছাড়া বাঙালি বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সমাজ বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব আছে, বাংলা সাহিত্য পড়ে তা টেরই পাওয়া যায় না। মহাশ্বেতা দেবীর কাছে বাংলা কথাসাহিত্য চিরঋণী হয়ে থাকবে এই কারণেই যে পূর্ব-ভারতের ভূমিপুত্র-কন্যাদের তিনি তাঁর লেখায় এনেছেন। এর ফলে ব্রাত্যজন পদাবলীর যে নিরন্তরের চেতনাপ্রবাহ, তার পরিচয় পাই। দলিত, ব্রাত্য আর কৌম জনজাতি-ই যে ভারতবর্ষ নামক সুপ্রাচীন সভ্য দেশের প্রাণ তা এমন করে বাংলা সাহিত্যে কেউ তুলে ধরেননি। এমনকি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সাঁওতাল-প্রতিবেশে জীবনের চল্লিশটি বছর কাটিয়েও তাদের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাননি। শান্তিনিকেতনে যে ব্রহ্মচর্যাশ্রম, সেখানকার চতুষ্পার্শেই তো সাঁওতালপল্লী। তাঁর কবিতা ও গানে সাঁওতালরা বড় রোমান্টিকভাবে উপস্থিত, তাদের আত্মতা নিয়ে নয়, যে আত্মতা দেখা গেছে রামকিঙ্করের সাঁওতালদের নিয়ে ছবি আঁকা ও ভাস্কর্য নির্মাণে। সাঁওতালি ছেলেকে সজল সঘন নববরষার কিশোর দূত কল্পনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তারপর সেখান থেকে তাকে নিয়ে গিয়েছেন আরো দূরবগাহ স্থানে তাই 'ঝড়ে চঞ্চল তমালবনের প্রাণে/ তোমাতে আমাতে মিলিয়াছি একখানে' কবির

অনুভবগম্য হলেও সাঁওতাল ছেলে ভিরমি খাবে হয়তো এ কথা শুনে। সাঁওতাল মেয়ের কথা পাই তাঁর 'ক্যামেলিয়া' কবিতায়, এবং সেখানেও রবীন্দ্রসৌন্দর্যতত্ত্বের দূতী সে, সাঁওতাল সমাজের অন্তরঙ্গ কেউ নয়।

মহাশ্বেতার আগে একমাত্র বিভূতিভূষণের লেখাতে বিশেষ করে *আরণ্যক* উপন্যাসে আদিবাসী সমাজের সম্ভ্রান্ত চিত্রণ লক্ষ্য করি। কেবল তা-ই নয়, লেখক আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ এনেছেন, দেখিয়েছেন, কীভাবে আর্য উপনিবেশবাদ প্রাগার্য ভারতীয় সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে, তার জন্য বেদনাবোধও করেছেন। যে উৎসাহ-কৌতূহল নিয়ে মিশর ভ্রমণে যায় দেশ-বিদেশের ভ্রমণার্থী মিশরের রাজারাজড়ার সমাধি দেখবার অদম্য বাসনায়, তার ভগ্নাংশ আগ্রহও দেখা যায় না দোবরু-পান্নাদের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্র দেখে আসবার। মিশরের Valley of Flowers আর দোবরু-পান্নাদের সমাধিস্থল যে একই মাহাত্ম্য ধরে, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের নিরিখে দুই-ই যে তুল্যমূল্য, বিভূতিভূষণ হিরন্ময় পাত্রের অভ্যন্তরে নিহিত এই সত্যটি আমাদের দেখিয়ে দেন। তাই আদিবাসী সমাজের অন্তরঙ্গতা-অতিথি পরায়ণতা-সহজতাই নয় কেবল, এখানে তারও অধিক কিছু মেলে পাঠকের।

মহাশ্বেতা দেবীতে আদিবাসী সমাজ আরো ব্যাপ্ত, বিচিত্র আর ব্যাখ্যেয় হয়ে উঠেছে। 'সাঁওতাল পল্লীতে উৎসব হবে', এ-জাতীয় বাহ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নয়, তিনি সাঁওতাল-শবর-লোধা সমাজকে দেখেছেন একেবারে মাটির কাছাকাছি থেকে। তাদের লোকাচার, ধর্ম বিশ্বাস, প্রেম-বিরহ-গান্ধর্ববোধ, প্রকৃতিলগ্নতা আর ঈশ্বরচেতনা, প্রান্তিক অরণ্যচারী মানুষ হিসেবে তাদের ওপর শোষক শ্রেণীর অত্যাচার ও তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া মহাশ্বেতার গল্প-উপন্যাসে বড় মরমী অন্তরঙ্গতায় বিন্যস্ত। সাঁওতাল তথা নিম্নবর্গীয় মানুষের নিয়ত সংগ্রামকে মহাশ্বেতা তাঁর লেখনীর আয়ুধ করেছেন। সেখানে কখনো সেই ব্রাত্য মানুষটি তার জীবন সংগ্রামে বিধ্বস্ত ও পরাজিত, আবার কখনো তার সাময়িক বিজয় দেখা গিয়েছে উচ্চবর্গ তথা এলিট শ্রেণীর বিরুদ্ধে কিন্তু সংগ্রাম তার ফুরোয়নি। হাজার হাজার বছর ধরে আজকের ইতিহাসের পরিভাষায় যাদের বলা হয় সাব অলটার্ন সেই ব্রাত্যজন পদাবলী মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যের অন্যতম বিশেষ অলঙ্কার। অন্যতম, মনে রাখতে হবে একমাত্র নয়।

মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্যভাবনার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা বিচিত্রমুখী ও মৃত্তিকাসংলগ্ন। নিকট ও দূরের ইতিহাসকে তিনি যেমন গ্রথিত করেন তাঁর সাহিত্যে, তেমনি সাম্প্রতিক সময়কেও ইতিহাসেরই বস্তুনিষ্ঠ তাৎপর্যে তুলে ধরেন তাঁর লেখায়। বর্তমানতার মধ্যেও তাই তাঁর লেখায় থাকে যেন দূরকালের ইতিহাসের বিভ্রম। সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী* তাঁর সমসময়ের দলিল, এমনকি যে বিয়াল্লিশের আন্দোলন নিয়ে রচনাটি, তাতে অংশগ্রহণও ছিল লেখকের। তবু পড়তে পড়তে মনে হয়, যেন কোন্ অতীতের রহস্যময়তা সেখানে। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *শোক মিছিল*-এর নামও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়।

তিন.

অরণ্যের অধিকার মহাশ্বেতার সাহিত্য রচনার মধ্যপর্বের ফসল। ১৯৭৭-এ প্রকাশিত এই উপন্যাসের জন্য ১৯৭৯-এ তিনি লাভ করেন *সাহিত্য একাদেমি পুরস্কার*। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর কেন্দ্রে রেখে গ্রন্থটির বিচার করা যায়, কেন-না এ উপন্যাসে সংহত হয়ে রয়েছে লেখকের বাস্তব অন্বেষা, সাহিত্যাদর্শ, নিম্নবর্গের মানুষের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা, অনন্য ভাষাশৈলী আর বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব।

ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে শোষণের বর্ণালী নিয়ে বিদেশী সরকার বছরের পর বছর ধরে যে গেন্ডুয়া খেলেছে, তার বিধুর ইতিহাস পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে অসংখ্য ঐতিহাসিকের লেখায়। এর পাশাপাশি ঔপনিবেশিক অত্যাচারের প্রতিবাদও দেশের নানাস্থানে গর্জে উঠেছিল। সে-সব বিদ্রোহের দলিল রয়ে গেছে বহু লেখকের রচনায়, সৃজন সাহিত্যে। আমাদের মনে পড়বে দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ*, বঙ্কিমচন্দ্রের *দেবী চৌধুরানী* এবং *আনন্দমঠ*, মীর মশাররফ হোসেনের *জমীদারদর্পণ*, শরৎচন্দ্রের *পথের দাবী*, সতীনাথ ভাদুড়ীর *জাগরী*, জহির রায়হানের *আরেক ফাল্গুন*, মুনীর চৌধুরীর *কবর*, শওকত ওসমানের *জাহান্নাম হইতে বিদায়*, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা* বিধৃত হয়ে আছে। আরো বহুতর লেখার নাম উহ্য রাখতে হল বাহুল্যবোধে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীর দায়বদ্ধতা ও মহাকাব্যিক বোধ এই উপন্যাসটিকে উল্লেখিত আর সব রচনা থেকে আলাদা করেছে। আমরা অতঃপর এ উপন্যাসটির বিশ্লেষণে গিয়ে দেখব, এ লেখার অনন্যতা কতখানি এবং কোথায়।

১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫, পলাশীর যুদ্ধ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ানি লাভ। ১৭৯৩, লর্ড কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। এসব জাঁতাকলে পড়ে ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ কৃষকশ্রেণীর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। সখারাম গণেশ দেউস্করের *দেশের কথা*, রমেশচন্দ্র দত্তের *Economic History of India*, দাদাভাই নওরোজির *Poverty and Un-British Rule in India* গ্রন্থে ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের চিত্র ধরা আছে। জন শোর লিখে গেছেন, ইংরেজের এদেশে রাজ্য শাসনের মূল নীতিই ছিল নিজেদের স্বার্থের বিনিময়ে সমগ্র ভারতীয় জাতিকে সর্ব প্রকারে গোলামে পরিণত করা। এজন্যই দেখা যায়, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষে (বাংলা ১১৭৬, যা *ছিয়াত্তরের মন্বন্তর* নামে পরিচিত) বাংলায় মৃত্যু হয়েছিল মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ এক কোটি মানুষের; তথাপি কোম্পানির রাজস্ব আদায় হয়েছিল আগের বছরের চেয়ে বেশি। ১৭৬৬ থেকে ৬৮, এই তিন বছরে, বাংলার গভর্নর হ্যারি ভেরেল্স্ট দেখাচ্ছেন, ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আমদানি হয়েছে ৬০ লক্ষ টাকা আর রপ্তানি হয়েছে সাড়ে ছ'কোটি টাকা; মার্কস্বাদী ঐতিহাসিক রজনীপাম দত্ত একে তাঁর *India Today* গ্রন্থে 'প্রত্যক্ষ লুণ্ঠনের যুগ' নামে আখ্যায়িত করেছেন, যার সময়কাল ছিল ১৭৫৭ থেকে ১৮১৩ পর্যন্ত। ১৮১৩ থেকে ১৮৫৮ সময়কে 'বাণিজ্যের যুগ' বলেছেন তিনি, যখন ইংল্যান্ডে প্রস্তুত বস্ত্র ভারতে রপ্তানি করা এবং ব্রিটেনের কলকারখানার জন্য ভারতে ব্রিটিশ পুঁজির আমদানি শুরু হয়। এই সময়কালে একদিকে দেশীয় কুটির শিল্পকে ধ্বংস করে ফেলে ইংরেজ, অন্যদিকে ভারত পরিণত হয় ব্রিটেনের কৃষি খামারে। এর পরবর্তী পর্যায় অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের যুগ, যা চিহ্নিত হয়ে আছে ব্যাঙ্ক, ইসিওরেন্স প্রতিষ্ঠান ও সওদাগর প্রতিষ্ঠানের প্রাদুর্ভাবে। এইভাবে অর্থনৈতিকভাবে ভারতকে নিঃস্ব করতে থাকে শাসক শক্তি, ইতিহাসে যাকে Drainage of Wealth বলা হচ্ছে। ভারতে সঞ্জাত বিপ্লব-বিদ্রোহ এগুলোর অবধারিত প্রতিক্রিয়া। মুন্ডা বিদ্রোহকে এই পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করতে হবে এবং এ বিদ্রোহের হোতা ও নায়ক বীরসা মুন্ডাকে নিয়ে লেখা উপন্যাস *অরণ্যের অধিকার*কে অনুধাবন করতে গেলে উপরোক্ত প্রেক্ষাপট আমাদের আলোচনার সহায়ক হবে।

উপনিবেশের পক্ষবিস্তার আর শোষণমুক্তির আকাঙ্ক্ষায় বিদ্রোহ, ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া, ফরাজি-ওয়াহাবি, নীল বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), কোল বিদ্রোহ (১৮৩২), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭), দাক্ষিণাত্য বিদ্রোহ (১৮৭৫), এমন আরো অজস্র। ১৯০০-তে এই পর্যায়ে মুন্ডাদের বিদ্রোহ, যাতে শহীদ হয়েছিলেন মাত্রই ২৫ বছরের বীরসা।

অন্যবর্গীয় ভারতবাসীর চেয়ে আদিবাসীদের জীবনধারা যেহেতু স্বতন্ত্র এবং প্রধানত অরণ্যনির্ভর, সেখানকার মানুষের প্রতি ইংরেজদের শোষণের মাত্রা ছিল বহুস্তরীয়। যেহেতু তাদের মধ্যে শিক্ষা পৌঁছয়নি এবং তাদের জীবনধারণ ছিল সরলতাময় তাই মহাজনদের হাতে তাদের প্রাথমিকভাবে অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হতে হত। এরপর শিক্ষার উদার আহ্বান জানিয়ে আবির্ভূত হলেন মিশনারিকুল, সঙ্গে অনুদার ধর্মান্তরকরণের মতলব নিয়ে। এ কাজে অভাবিত সাফল্য লাভ ঘটেছিল কী এ্যাংলিকান, আর কী লুথারান মিশনারিদের। ধর্মের মাধ্যমে তৈরি হল এক বশ্য সম্প্রদায় আদিবাসীদের মধ্য থেকে, যে ধর্মান্তরিতরা প্রভু-সান্নিধ্য পেত তাদের গৃহের ঝি চাকর রাঁধুনি তথা পরিচর্যাকারী রূপে। বীরসাও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন– যদিও পরে তিনি ছিঁড়ে ফেলেন তাঁর সেই ধর্মতন্ত্রজাল, ঘোষণা করেন নিজেকে 'ধরতি আবা' (ধরণীর পিতা) বলে।

মহাশ্বেতা তাঁর উপন্যাসে বীরসার এই ঐশী মনস্তত্ত্বকে গুরুত্বের সঙ্গে স্থাপন করে তাকে যোজিত-সম্প্রসারিত করেছেন স্ব-সম্প্রদায়ের মনে। নেতার মধ্যে এই যে ঐশী ক্ষমতাকে জারিত করা, এতে অনুসারীদের মধ্যে তৈরি হয় আস্থা, অনুরাগ, ইতিবাচকতা এবং চূড়ান্ত আশাবাদ। জোয়ান অফ আর্কের মধ্যে এই বোধ ক্রিয়াশীল ছিল যে তিনি দৈবাদেশ প্রাপ্ত। তিতুমীর ও তার অনুসারীদের বিশ্বাস ছিল, ইংরেজের গুলি তিতুমীরের কোন ক্ষতি করবে না, গুলি খেয়ে নেবেন তিনি। গীতায় অর্জুন তথা সর্বকালের যোদ্ধাকে

প্রকৃতির সঙ্গে বীরসার নিবিড় লগ্নতা এর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, তাই ক্রন্দনরতা অরণ্যকে জননী ভেবে বীরসার কথোপকথন নিরুপম সেই অরণ্যমানবী, বনমাতা, বনদেবীর সঙ্গে। বীরসা তার কাছে তার অবস্থান জানতে চাইলে সেই অরণ্যমাতা উত্তর দেয়, 'তোর বুকে তোর রক্তে।' এই কথাটির মধ্যে আরণ্যক মানুষের সঙ্গে অরণ্যের নাড়ির যোগটি সর্বব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।

উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, যুদ্ধে জয়ী হলে 'জিত্বাতু ভোক্ষসে মহীম'– পৃথিবী ভোগ করবে (বাস্তবে অর্জুন বা যুদ্ধজয়ী যে-কোন সৈনিক মহীর কতটুকু পায়!)। তা ছাড়া মৃত্যু হলে স্বর্গসুখ তো বাঁধা! ইসলামেও গাজী ও শহীদ হবার অনুরূপ পরামর্শ ও আহ্বান। এর অনুকুলে কালিদাস তাঁর অমর কাব্য *রঘুবংশম*-এ চমৎকার এক ছবি এঁকেছেন যুদ্ধে নিহত সৈনিকের, চমৎকার ও একইসঙ্গে প্রলুব্ধকারী। স্বয়ম্বরে ইন্দুমতীকে লাভ করে অজ অযোধ্যায় ফেরার সময় ব্যর্থ রাজারা আক্রমণ করছে অজকে আর অজ হত্যা করছেন তাদের। শত্রুর খড়্গাঘাতে ছিন্নমুণ্ড অতএব সে-মুহূর্তেই সে স্বর্গে এবং সুরললনাদের একেবারে জড়িয়ে ধরে (তাৎক্ষণিক ফলপ্রাপ্তি!), অন্যদিকে নীচে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে সে তার কবন্ধটিকে দেখতে পাচ্ছে। সে মূর্তি তখন নৃত্যপর। আসলে মুণ্ডহীন ধড় তো, বেসামাল!

মহাশ্বেতার বীরসা ইতিহাসের বীরসা নন, লেখকের সৃজনশীলতার অভিজ্ঞান ও নির্যাস যেমন হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাস, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানী, মীর মশাররফের হাসান জয়নাব এজিদ মোয়াবিয়া বা সমারসেট মমের ভ্যানগগ। প্রকৃতির সঙ্গে বীরসার নিবিড় লগ্নতা এর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়ানো, তাই ক্রন্দনরতা অরণ্যকে জননী ভেবে বীরসার কথোপকথন নিরুপম সেই অরণ্যমানবী, বনমাতা, বনদেবীর সঙ্গে। বীরসা তার কাছে তার অবস্থান জানতে চাইলে সেই অরণ্যমাতা উত্তর দেয়, 'তোর বুকে তোর রক্তে।' এই কথাটির মধ্যে আরণ্যক মানুষের সঙ্গে অরণ্যের নাড়ির যোগটি সর্বব্যাপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা পেয়েছি, মা কী ছিলেন ও কী হইয়াছেন। মহাশ্বেতা আরো কঠিন ক্লোজ-আপে দেখালেন, অরণ্যমাতা আজ লেংটা! 'কে তোমাকে লেংটা করেছে মা? আমি... তোমার লাজ ঢেকে দিব।'

প্রয়াস ছিল বীরসার, সঙ্কল্প ছিল, পারেনি, উপনিবেশের অসীম ডানা বিস্তার তার বিপরীতে! বিভূতিভূষণ *আরণ্যক* উপন্যাসে একদিকে প্রান্তিক জনজীবনকে ধরেছিলেন, অন্যদিকে অরণ্য ধ্বংস করে তথাকথিত সভ্যতা বিস্তারের কথা লিখে গেছেন, ব্যঙ্গচ্ছলে যে উপনিবেশের নাম তিনি 'নয়া লবটুলিয়া' দিয়েছেন। অরণ্যনিধনের কারিগর হিসেবে সত্যচরণ আসলে যিনি লেখক-ই স্বয়ং দোষী সাব্যস্ত করে নিজের সত্য উচ্চারণের মাধ্যমে অন্তত পাঠকের করুণা লাভ করেছে। মহাশ্বেতা তাঁর এ-উপন্যাসে আরো কঠিন বাস্তবতা এনে দেখিয়েছেন, স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত বাধলে প্রতিপক্ষকে একচুল রেয়াত করে না ঔপনিবেশিক শাসক। সেখানে বীরসা তিতুমীর সিধু কানুর সঙ্গে মাস্টারদা ভগৎ সিং অভিন্ন।

উপন্যাসটি পাঠক ও সমালোচক মহলে বহু আলোচিত হলেও মহাশ্বেতা কিন্তু তাঁর প্রিয়তম লেখার মধ্যে বইটিকে স্থান দেননি। তিনি এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর উল্লেখযোগ্য লেখাগুলোর মধ্যে বিবেচনা করেন *কবি বন্দ্যঘটী গাঞীর জীবন ও মৃত্যু*, *ছোট্টি মুন্ডা এবং তার তীর*, *অপারেশন বসাই টুডু*। তা ছাড়া *অমৃত সঞ্চয়*, *আঁধার মানিক*। *অমৃত সঞ্চয়* সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে লেখা।

চার.

পেশাদার লেখক হিসেবে মহাশ্বেতা দেবী প্রচুর লিখেছেন। ছাত্রজীবনে তিনি একবার নাকি রবীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি এত লিখেছ কেন?' সেই মহাশ্বেতা দেবীর রচনাবলী এ পর্যন্ত চোদ্দ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। রচনাবলীর সম্পাদক অজয় গুপ্ত জানিয়েছেন, মোটামুটি তিরিশ খণ্ডে সমাপ্ত হবে তাঁর যাবতীয় রচনা। কেবল দেড়শো উপন্যাস এবং আনুমানিক সাড়ে তিনশোর মত গল্প-ই তো লিখে গেছেন তিনি। তাছাড়া অসংখ্য বিষয়ে ছোট বড় বারো-চোদ্দশো প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, সামাজিক কৃত্য বলে যা তিনি মনে করতেন। *এক জীবন* নাম দিয়ে আত্মজীবনীও লিখেছিলেন ধারাবাহিকভাবে কোন এক পত্রিকায়, গ্রন্থাকারে যা এখনো প্রকাশিত হয়নি। তাছাড়া দেশে-বিদেশে অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর পত্র বিনিময়। সেসব সংগৃহীত হয়ে প্রকাশিত হলে আমরা অন্তরঙ্গ ও অন্য মহাশ্বেতার পরিচয় পেতে পারব। সুদীর্ঘ জীবনে সাক্ষাৎকার-ই তো দিয়েছেন একশোর ওপর– সৃষ্টিশীল এই লেখককে জানতে যার মূল্য অপরিসীম। তাঁকে নিয়ে একাধিক তথ্যচিত্র তুলেছেন অনেকে। তাঁদের মধ্যে মালয়ালমভাষী জোসি যোসেফ তো তাঁকে নিয়ে ১৪০ ঘণ্টা ধরে রেখেছেন সেলুলয়েডে। তার থেকে দুটো তথ্যচিত্র ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গিয়েছে *Journey with Mahasweta Devi* এবং *Mahasweta Devi : Close-up* নামে। এই তথ্যচিত্র দুটিতে মহাশ্বেতার আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে আগ্রহ ও কৌতূহলের নানা প্রমাণের মধ্যে একটি হল, এক জায়গায় তিনি সদ্য প্রয়াত বিখ্যাত ইরানী চলচ্চিত্র পরিচালক আব্বাস কিয়ারোস্তামীর *Five* ছবিটি দেখছেন। মহাশ্বেতাকে নিয়ে আরো একটি তথ্যচিত্র রয়েছে যোসেফের *Serentidipy Cinema* নামে। যএই যে এত এত লেখা, তার বিষয়বস্তুও ছিল বিচিত্র। আদিবাসী সমাজ-ই কিন্তু তাঁর একমাত্র বিচরণক্ষেত্র ছিল না। *ঝাঁসীর রানী*র মত একাধিক ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস রয়েছে তাঁর। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে উপন্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি তিতুমীরকে নিয়ে উপন্যাস রয়েছে তাঁর। কৈবর্ত বিদ্রোহ নিয়ে রয়েছে যেমন *কৈবর্তখণ্ড*, ঠিক তেমন-ই *আঁধার মানিক* বাংলায় বর্গী আক্রমণ নিয়ে লেখা। *নটী* আরেক সিপাহী বিদ্রোহকেন্দ্রিক উপন্যাস। প্রাক-চৈতন্যদেবের বাংলা যেমন ধরা পড়েছে তাঁর *বেনে বউ* উপন্যাসে, অন্য এক উপন্যাস *বিবেক বিদায় পালা*তে তিনি ধরেছেন শ্রী চৈতন্য ও তাঁর সমসময়কে। এ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড লেখার ইচ্ছে ছিল তাঁর। দুর্ভাগ্য, নানান উপকরণ সংগৃহীত হলেও শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে ওঠেনি এ-উপন্যাসের খণ্ডটি।

ইতিহাস ছাড়াও তাঁর আগ্রহ ছিল মনুষ্য-মনস্তত্ত্বে, নারীদের একান্ত নিজস্ব জগত নিয়ে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অবস্থানের প্রশ্নটি নিয়ত ভাবাত তাঁকে। *মূর্তি* উপন্যাসে তাই দেখি বালবিধরা দুলালীর ভাসমান অনিশ্চিত অসহায় জীবনযাপন, *সতী*তে অমার একে কন্যা, তায় কালো সন্তান জন্মালে শ্বশুরকুলের কেউ দেখতেই এল না নার্সিং হোমে। নারীবাদের আবহ তৈরিতে নয়, এ-লেখা মহাশ্বেতা কিন্তু লেখেন মানবিকতাবোধ থেকে উৎসারিত তাঁর মহনীয়তা থেকে। তাঁর বেশ কিছু ছোটগল্পে নারী নির্যাতনের যে ভয়ংকরতা, তা পড়লে শিউরে উঠে মানুষকে সবার উপরে সত্য বলতে দ্বিধা হবে আমাদের। পণের দায়ে কন্যার স্ত্রী-অঙ্গকে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, 'স্তনদায়িনী'র মত গল্প তো বিশ্বসাহিত্যেই পরম রত্ন বলে গণ্য হবার যোগ্য। এছাড়াও 'সাত নম্বর আত্মহত্যা', 'দ্রৌপদী', 'প্রতি চুয়ান্ন মিনিটে', 'বৈসুচনের সেনা' ইত্যাদি গল্পে নারীর প্রতি অবমাননা, ধর্ষণ, নারী হত্যার মত নৃশংসতাও উপস্থিত। গল্পগুলি এ-যুগের ভোগবাদী সমাজে নারীর প্রতি পুরুষের যেন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, এমন প্রতীতি জন্মে।

সমাজে নানা অবস্থানের নারী-পুরুষই তাঁর লেখায় উঠে আসে বাস্তবতার প্রামাণ্য দলিল হয়ে। কৃষক, ব্যবসায়ী, ভিক্ষুক, সেলস্‌ম্যান

থেকে রাজনৈতিক কর্মী, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, জমিদার, আমলা– এক বিস্তৃত ব্যাপক জগৎ ছাড়িয়ে আছে তাঁর কথাসাহিত্যে। বিচিত্র পেশাজীবী মানুষ– যারা সাপ ধরে সংসার চালায়, পাখি ধরে যারা, মর্গের ডোম, কবরের দেখভাল করা মানুষ, হাতির মাহুত যারা, এদেরও তাঁর লেখায় নিয়ে এসেছেন তিনি। বিষয়বস্তু যেমন, নিজের ভাষাকে তেমনি তিনি শাণিত করে তুলেছিলেন। এইদিক থেকে দেখতে গেলে তিনি স্বতন্ত্র এক ভাষাশৈলীরও নির্মাতা। সামান্য একটু উদাহরণ দেওয়া যাক তাঁর অতি বিখ্যাত গল্প 'স্তনদায়িনী' থেকে, যেটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল *এক্ষণ* পত্রিকায়, ১৯৭৭-এ– 'হালদারকর্তা পাত্র না দেখে দয়া করেন না। তিনি স্বাধীন ভারতের বাসিন্দা, যে ভারত মানুষে মানুষে, রাজ্যে রাজ্যে, ভাষায় ভাষায়, রাঢী-বারেন্দ্র-বৈদিকে, উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ও দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থে, কাপ-কুলীনে প্রভেদ করে না। কিন্তু তিনি পয়সা করেছেন ব্রিটিশ আমলে, যখন ডিভাইড এন্ড রুল ছিল। হালদারকর্তার মানসিকতা তখনই গঠিত হয়ে গেছে। ফলে তিনি পাঞ্জাবি, ওড়িয়া, বিহারি, গুজরাটি, মারাঠি, মুসলমান, কারুকে বিশ্বাস করেন না এবং দুর্গত বিহারি শিশু বা অনাহারে কাতর ওড়িয়া ভিখারি দেখলে তার বিয়াল্লিশ ইঞ্চি গোপাল গেঞ্জির নিচে অবস্থিত চর্বিতে সুরক্ষিত হৃৎপিণ্ডে করুণার ঘামাচি আদপে চুলকায় না।' নির্মম পরিহাস ও ব্যঙ্গের ভাষা। এমন রচনায় মহাশ্বেতা সিদ্ধহস্ত। তাই মহাশ্বেতার যে-কোন রচনাই আস্বাদ্য।

পাঁচ.

মহাশ্বেতাকে শান্তিনিকেতনে ভর্তি করাতে নিয়ে গিয়ে কাঠবেড়ালি চিনিয়েছিলেন তার পিতা মনীশ ঘটক। দিনাজপুরে থাকতে পিতা নাকি বাঘ শিকারও করেছিলেন। অন্যদিকে তাঁর মা পরিচিত হয়েছিলেন বিখ্যাত মার্কিন লেখিকা, নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত পার্ল এস বাক-এর সঙ্গে, বাক যে-বার মুম্বইতে আসেন। মহাশ্বেতার স্বামী ছিলেন আদর্শগতভাবে এক কমিউনিস্ট নাট্যকার অভিনেতা নাট্য পরিচালক যাঁর *নবান্ন* নাটক বাংলা নাটকের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছিল। কাকা ঋত্বিক ছিলেন অবিস্মরণীয় চলচ্চিত্র স্রষ্টা। কেবল তা-ই নয়, নাট্যকার-অভিনেতারূপেও ঋত্বিক এক অত্যন্ত প্রতিভাধর পুরুষ। তাঁর জীবনে ঘটেছে ঈর্ষণীয় গুণীজন সান্নিধ্য, যার কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, যার মধুর ভাষণ শুনেছেন তিনি শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক-পর্বে। স্নেহ লাভ করেছেন কবির পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তখন উপাচার্য, ১৯৪৫-এ, মহাশ্বেতার দ্বিতীয় পর্বে শান্তিনিকেতন বাসের সময়। সে-সময়কার এক অনন্য অবনীন্দ্রনাথের ছবি ধরা ছিল মহাশ্বেতার স্মৃতিতে, রাহুল দাশগুপ্তকে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে জানাচ্ছেন তিনি, 'আমরা গিয়েছি ওঁর কাছে, দেখি হলুদ পলাশ ফুল সামনে রেখে মুগ্ধ চোখে দেখছেন।' এরপরই মহাশ্বেতার স্বীকারোক্তি, শান্তিনিকেতন প্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করতে, ভালবাসতে শিখিয়েছিল। এজন্যই তো তিনি ওখানে বৃক্ষনিধন ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে ইট কাঠ পাথরের বহুতল গড়ে তোলার বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হন, সিঙ্গুরে ভূমিহারা কৃষকদের পাশে এসেও দাঁড়াতে দেখি তাঁকে। শান্তিনিকেতনে তাঁর মামা শঙ্খ চৌধুরী যেমন, তেমনি বিনোদবিহারী রামকিঙ্করদের নিয়ত দেখেছেন। দ্বিতীয়পর্বে সহপাঠী ছিলেন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, বিদ্যাবত্তায় যাঁর জুড়ি ছিল না বলে তাঁর নাম 'মুখোজ্জ্বল হায়দার'-এ পরিণত হয়েছিল। '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হন মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের দুই বিখ্যাত লেখক আখতারুজ্জামান ইলিয়াস এবং হাসান আজিজুল হকের সঙ্গে তাঁর সখ্য সুবিদিত। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে এ সমস্তই নির্মিতি দিয়েছে তাঁকে। দেশ-বিদেশে বহুবার ভ্রমণ করে তাঁর অভিজ্ঞতাকে ঋদ্ধ করেছেন তিনি। এক প্রদীপ শিখা থেকে অন্য দীপ জ্বলে ওঠে যেমন, তেমনি তাঁর একমাত্র পুত্র নবারুণ, বাংলাসাহিত্যে এক প্রবল শক্তিধর লেখক। নবারুণ ২০১৪ সালের ৩১ জুলাই ৬৬ বছর বয়সে কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর কবিতার একটি স্মরণীয় লাইন: 'এ মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না...।'

মহাশ্বেতা লেখক, *বর্তিকা* নামে পত্রিকার সম্পাদক, সোস্যাল অ্যাক্টিভিস্ট, অধ্যাপক, *পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির* একদা সভাপতি। *সাহিত্য আকাদেমি* (দিল্লি)সহ *জ্ঞানপীঠ*, বিশ্বভারতীর *দেশিকোত্তম*, ভারত সরকারের *পদ্মশ্রী* পুরস্কারে ভূষিত। পেয়েছেন *ম্যাগসেসাই* পুরস্কার। বহু বিশ্ববিদ্যালয় দিয়েছে তাঁকে সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি। বেড়িয়েছেন বাংলাদেশে, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকা, সুইজারল্যান্ড ও আরো বহু দেশ। তাঁর রচনা অনূদিত হয়েছে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়– হিন্দি, তামিল, কন্নড়, মারাঠি, মালয়ালম, অসমীয়, তেলুগু, ওড়িয়া, হো, গুজরাটিতে। তিনি নিজেও অনুবাদ করেছেন বহু গ্রন্থ। লিখেছেন শিশু-সাহিত্য, পাঠ্যবই। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি, সুইডিশ, ইতালী প্রভৃতি বিদেশি ভাষাতেও তিনি বহুল অনূদিত। একাধিকবার তাঁর নাম উঠেছিল নোবেল লিস্টে, যদিও শেষ পর্যন্ত তিনি পাননি। তাঁকে নিয়ে গবেষণা করে পিএইচ ডি করেছেন দু-তিনজন, গ্রন্থ লিখেছেন বেশ কয়েকজন, আর তাঁকে নিয়ে লেখা প্রবন্ধের তো গোনাগুনতি নেই।

আটাশে জুলাই ২০১৬ বৃহস্পতিবার তাঁর জীবনাবসান সত্যিই একটি যুগের অবসান। তাঁর লেখা পাঠ করে যাতে সমৃদ্ধ হতে পারি, সেই প্রয়াসই হবে তাঁর প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন।

মলয়চন্দন মুখোপাধ্যায়
ভারতের লেখক, প্রাবন্ধিক

বাংলাদেশ-ভারত
মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

দর্শন

সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন

সজীবকুমার বসু

ড. সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণকে শিক্ষিত সমাজ একজন দর্শনপ্রেমিক হিসেবে মনে রেখেছেন। সাধারণ মানুষ তাঁকে ভারতের রাষ্ট্রপতি হিসেবে জানে। তিনি তাঁর অসংখ্য শিক্ষামূলক বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ভারতের অন্যতম শিক্ষাবিদ হিসেবে আজও সম্মানিত। তিনি নিজেই বলেছেন– Education has been my special subject। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক। দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে পৃথিবীব্যাপী তাঁর খ্যাতি। তাঁর প্রতিভার ধারা ও পাণ্ডিত্য এমন ছিল যে তিনি যে-কোন বিষয়ে অনায়াসে আলোচনা করতে পারতেন। তিনি শুধু একজন প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন দার্শনিক, সাহিত্যিক, লেখক, সুবক্তা, এক দক্ষ কূটনীতিক এবং রাষ্ট্রনায়ক। তিনি একইসঙ্গে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মৌলিক চিন্তা বক্তৃতার আকারে ও লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

ড. রাধাকৃষ্ণণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ কথাও মানতে হবে যে আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারেননি। চতুর্দিকের ক্ষুদ্রতা, মূঢ়তা, ভয় আমাদের প্রিয় দেশের বিস্তর ক্ষতিসাধন করে চলেছে। আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা কত জ্ঞান অর্জন করি তার দ্বারা হয় না, আমাদের পারস্পরিক ও সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় বোঝা যায়।' ড. রাধাকৃষ্ণণের মতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে।

ড. রাধাকৃষ্ণণের দর্শনের মৌল নীতিগুলো হল: ১. বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি ২. দর্শন ও ধর্মের ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ৩. আধ্যাত্মিকতা ও ৪. মানবতাবোধ। অসাধারণ ছিল তাঁর সমন্বয়ী ক্ষমতা। তিনি মনে করতেন এই সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারত ও প্রতীচী উভয়েই উপকৃত হবে। ড. রাধাকৃষ্ণণকে দার্শনিক রাজা হিসেবে অভিহিত করা হয়। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ১৯৭৫ সালে তিনি টেম্‌প্লেটন পুরস্কারে ভূষিত হন।

বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মচিন্তার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। রাধাকৃষ্ণণের ধর্মচিন্তা বিষয়ে আলোচনার আগে ধর্ম কী সে-সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা দরকার। ধর্ম 'ধৃ' ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার সোজা অর্থ হল ধারণ করা। সাধারণ মানুষ ধর্মকে ধারণ করে বা ধর্মের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে ইহজগত ও পরজগতে শান্তি ভোগ করার আশা পোষণ করে। পৃথিবীতে বহু ধর্ম রয়েছে। এসবের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, ইসলাম, ইহুদি, খ্রিস্টান ধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। হিন্দু ধর্মকে সনাতন ধর্ম বলা হয়। ঈশ্বর আর্য মুনি-ঋষিদের মাধ্যমে এ ধরাধামে যে আচার-আচরণ বা বিধি-নিষেধ দ্বারা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ বা সুন্দরভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেছেন তাই মূলত সনাতন ধর্ম। দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণ সর্বজীবের মুক্তি কামনা করেছেন। সর্বজীবের মুক্তির বাণী ভারতের চিরায়ত বাণী– সর্বোপনিষদের বাণী। রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন এই শাশ্বত জীবনের ভাষ্যকার। তিনি ছিলেন হিন্দুর জীবনবেদ ব্যাখ্যাকার। ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *The Hindu View of Life* গ্রন্থে বলেছেন– Hinduism is more a way of life than a form of thought. While it gives absolute liberty in the field of thought it enjoins a strict code of practice. Hinduism insists not on religious conformity button a spiritual and ethical outlook in life. ড. রাধাকৃষ্ণণ তাঁর *Eastern Religion and Western Thought* বইয়ে সার্বজনীন ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই বইটিকে ধর্মের সন্ধিকাল হিসেবে ইঙ্গিত করা যেতে পারে। এখানে তিনি কিভাবে উপনিষদের অতীন্দ্রিয়বাদ পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে ক্রমান্বয়ে প্রভাবিত করে চলেছে তার ব্যাখ্যা করেছেন। ড. রাধাকৃষ্ণণ ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিষয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ কথাও মানতে হবে যে আমাদের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বগণ সঠিক পথ অনুসরণ করতে পারেননি। চতুর্দিকের ক্ষুদ্রতা, মূঢ়তা, ভয় আমাদের প্রিয় দেশের বিস্তর ক্ষতিসাধন করে চলেছে। আমাদের প্রকৃত পরিচয় আমরা কত জ্ঞান অর্জন করি তার দ্বারা হয় না, আমাদের পারস্পরিক ও সামাজিক আচরণ দ্বারা প্রকৃত পরিচয় বোঝা যায়।' ড. রাধাকৃষ্ণণের মতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে। তিনি এই পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে উপনিষদ, ভগবদ্গীতা এবং ব্রহ্মসূত্রের ওপর যে ধরনের কাজ করেছেন তা প্রাশ্চাত্য দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। এ সম্পর্কে *Encyclopedia of World Biography* থেকে উদ্বৃতি দেওয়া যেতে পারে:

His translation and interpretation of Bhagavadgita (Sons of the Lord) strives to move traditional Hindu institutions (for instance, the caste system) in the direction of the democratic values. He proved himself capable of performing this potentially awkward synthetic task by stressing the more profound aspects of Hindu Philosophy which inherently transcend the provisional historical and social forms associated with normative Hinduism (Page-77).

সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণকে ভারতবাসী রাষ্ট্রপতি হিসেবে যতটা মনে রেখেছে, তার থেকেও অনেক দিন মনে রাখবে তাঁর দর্শন ও ধর্মের ওপর লেখা বিভিন্ন প্রামাণ্য পুস্তকের জন্য। তাঁর লেখার মধ্য দিয়েই পরবর্তী প্রজন্ম বুঝতে পারবে যে তিনি কিভাবে জীবনের অর্থকে ব্যাখ্যা করেছেন। বলা যেতে পারে যে, রাধাকৃষ্ণণের ধর্মীয় চিন্তা বা মূল্যবোধ ভারতীয় দর্শনে এক নবজাগরণের সৃষ্টি করেছে। তিনি প্রাচীন বিদ্যা এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত মূল্যের মধ্যে নতুন করে এক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন। যুগের সঙ্গে তাল রেখে ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে পরিবর্তন না আনতে পারলে প্রাচীন বিষয়গুলো ক্রমশ অচল হয়ে পড়বে, একথা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর লেখা বহু বইয়ের মধ্যে *The Hindu View of Life* বইটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল এবং বহু দেশি-বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। তাঁর বিভিন্ন বই থেকে তাঁর ধর্মচিন্তার নানা বিষয় সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। *Kalki or the Future of Civilization* বইটিতে রাধাকৃষ্ণণ বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে কিভাবে ব্যবহার করছে। তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে মানুষের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে আমাদের শাশ্বত সত্য ও মূল্যবোধের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মেলবন্ধনের ওপর জোর দিতে হবে। এই দুইয়ের সমন্বয়ে আমাদের বাঁচতে হবে। রাধাকৃষ্ণণের বিখ্যাত বইগুলির মূল্যবান দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর বিশেষ অবদান। সমকালীন সময়ে রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শনের প্রাসঙ্গিকতা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি বলেন, বিশ্বে শান্তি স্থাপন করা, যুদ্ধরোধ করা, নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়ন সাধন করা এ সবেরই ভিত্তি সামাজিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ। জাতিসংঘে প্রদত্ত তাঁর মানব প্রেমের বাণী, বিশ্বশান্তির বাণী এবং 'One World' বা একটি বিশ্বরাষ্ট্রের আন্তরিক আবেদন বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

আজ সমগ্র বিশ্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ধর্মের নামে মৌলবাদের অপতৎপরতা, নিপীড়ন, নির্যাতন। ধর্মীয় মানবতার বাণী আজ ভূলুণ্ঠিত। এই প্রেক্ষাপটে বিশিষ্ট দার্শনিক রাধাকৃষ্ণণের ধর্মচিন্তার অমিয় বাণীর প্রসার আজ বড় বেশি প্রয়োজন যার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও ধর্মীয় সহিষ্ণুতামূলক মনোভাব। রাধাকৃষ্ণণের ধর্মদর্শন তথা ধর্মচিন্তার প্রাসঙ্গিকতা তাই আজ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

সজীবকুমার বসু
গবেষক, প্রাবন্ধিক

রাজ্য পরিচিতি

পশ্চিমবঙ্গ

ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসংখ্যা প্রায় ১০ কোটি। এটি ভারতের চতুর্থ সর্বাধিক জনবহুল রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গের আয়তন ৩৪,২৬৭ বর্গমাইল (৮৮,৭৫০ বর্গ কিমি)। এর উত্তরে ভারতের সিকিম, উত্তর-পূর্বে ভুটানের পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্যাঞ্চল, উত্তর-পশ্চিমে নেপালের পূর্বাঞ্চল; পূর্ব দিকে ভারতের অসম এবং বাংলাদেশের রংপুর, রাজশাহী ও খুলনা বিভাগ; পশ্চিমে ভারতের বিহার, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতা। উত্তরের হিমালয় পর্বতশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি অঞ্চলকে বাদ দিলে এ রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাই গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলের অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ, ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য এবং অসমের বরাক উপত্যকা বাঙালি জাতি অধ্যুষিত বঙ্গ অঞ্চলের অন্তর্গত।

এক নজরে কলকাতা

দেশ	ভারত
অঞ্চল	পূর্ব ভারত
রাজধানী	কলকাতা
বৃহত্তম শহর/ বৃহত্তম মহানগর অঞ্চল	কলকাতা
জেলা	২০টি
প্রতিষ্ঠা	১৫ আগস্ট ১৯৪৭
সরকার	
• শাসকবর্গ	পশ্চিমবঙ্গ সরকার
• রাজ্যপাল	কেশরীনাথ ত্রিপাঠী
• মুখ্যমন্ত্রী	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (তৃণমূল কংগ্রেস)
• আইনসভা	পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা (২৯৫টি আসন)
• হাইকোর্ট	কলকাতা হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	৮৮৭৫২ কিমি (৩৪২৬৭ বর্গমাইল)
• এলাকার ক্রম	চতুর্দশ
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৯,১৩,৪৭,৭৩৬
• ক্রম	চতুর্থ
• ঘনত্ব	১০০০/কিমি (২৭০০/বর্গমাইল)
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও ৩১৬৬ কোড	IN-WB
সরকারি ভাষা	বাংলা, ইংরেজি ও অন্যান্য
ওয়েবসাইট	westbengal.gov.in

কেশরীনাথ ত্রিপাঠী

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

অধুনা 'পশ্চিমবঙ্গ' নামে পরিচিত অঞ্চলটি প্রাচীনকালে বঙ্গ, রাঢ়, পুণ্ড্র ও সুহ্ম জনপদের অন্তর্গত ছিল। পরবর্তীকালে এই অঞ্চল মৌর্য সাম্রাজ্য (খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) ও গুপ্ত সাম্রাজ্য (খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী) এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন আঞ্চলিক পাল সাম্রাজ্য (খ্রিস্টীয় অষ্টম-একাদশ শতাব্দী) এবং সেন সাম্রাজ্যের (খ্রিস্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) অন্তর্ভুক্ত হয়। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই অঞ্চল শাসিত হয় বাংলা সালতানাত, হিন্দু রাজন্যবর্গ ও বারো ভুঁইয়া নামে পরিচিত জমিদারবর্গের দ্বারা। এরপর বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ঘটে। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলাসহ ভারতের বিস্তীর্ণ অংশের শাসন কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেয়। এরপর ১৯১১ সাল পর্যন্ত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। ব্রিটিশ শাসনের ফলশ্রুতিতে ভারতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানচেতনার প্রসার ঘটলে কলকাতাকে কেন্দ্র করে হিন্দু বাঙালি সমাজে এক ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সূচনা হয়। বাংলার ইতিহাসে এই আন্দোলন 'বাংলার নবজাগরণ' নামে পরিচিত। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ ভূখণ্ড ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম কেন্দ্র। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সময় ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা বিভাজিত হয়। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি রাজ্যে পরিণত হয়। অন্যদিকে মুসলমান-প্রধান পূর্ববঙ্গ নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী মতবাদ ও আন্দোলন প্রসার লাভ করে। ১৯৭৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ শাসন করে কমিউনিস্ট বামফ্রন্ট সরকার। ২০১১ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্টকে পরাজিত করে দক্ষিণপন্থী দল তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করেছে।

ভারতের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনে কৃষিপ্রধান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থান ষষ্ঠ। রাজনৈতিক সক্রিয়তার জন্য বিশেষভাবে পরিচিত হলেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজ্যের রাজধানী কলকাতাকে 'ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী' বলা হয়ে থাকে। নিজস্ব লোকসংস্কৃতি ছাড়াও এই রাজ্যের একটি সমৃদ্ধ মূলধারার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার জয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে বহু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের কর্মস্থল ছিল এই রাজ্য। দার্জিলিং হিমালয়ান রেল ও সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান পশ্চিমবঙ্গের দুটি ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান।

বঙ্গ বা বাংলা নামের সঠিক উৎস আজও অজ্ঞাত। এ নিয়ে একাধিক মতবাদ প্রচলিত। একটি মতে এটি খ্রিস্টপূর্ব ১০০০ অব্দে এই অঞ্চলে বসবাসকারী দ্রাবিড় উপজাতির ভাষা থেকে এসেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে বঙ্গ নামটি অনেক জায়গাতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারতের বাংলা প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল স্বাধীন ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হলে এই রাজ্যের নামকরণ পশ্চিমবঙ্গ করা হয়েছিল। ইংরেজিতে অবশ্য West Bengal নামটিই সরকারিভাবে প্রচলিত।

বৃহত্তর বঙ্গদেশে সভ্যতার সূচনা ঘটে আজ থেকে ৪ হাজার বছর আগে। এ সময় দ্রাবিড়, তিব্বতি-বর্মি ও অস্ট্রো-এশীয় জাতিগোষ্ঠী এ অঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। বঙ্গ বা বাংলা শব্দের প্রকৃত উৎস জানা না গেলেও মনে করা হয়, ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ যে দ্রাবিড়-ভাষী বংজাতিগোষ্ঠী এ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, তারই নামানুসারে এ অঞ্চলের নামকরণ হয় বঙ্গ। গ্রিক সূত্র থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০ অব্দ নাগাদ গঙ্গারিডাই নামে একটি অঞ্চলের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। সম্ভবত এটি বৈদেশিক সাহিত্যে বাংলার প্রাচীনতম উল্লেখগুলির অন্যতম। মনে করা হয়, এই গঙ্গারিডাই শব্দটি গঙ্গাহৃদ (অর্থাৎ, গঙ্গা যে অঞ্চলের হৃদয়ে প্রবাহিত) শব্দের অপভ্রংশ। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে বাংলা ও বিহারঅঞ্চল নিয়ে গড়ে ওঠে মগধ রাজ্য। একাধিক মহাজনপদের সমষ্টি এই মগধ রাজ্য ছিল মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতের চারটি প্রধান রাজ্যের অন্যতম। মৌর্য রাজবংশের রাজত্বকালে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ এশিয়া মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে এই সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি মহামতি অশোকের রাজত্বকালে আফগানিস্তান ও পারস্যের কিছু অংশও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রাচীনকালে জাভা, সুমাত্রা ও শ্যামদেশের (অধুনা থাইল্যান্ড) সঙ্গে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ *মহাবংশ* অনুসারে, বিজয় সিংহ নামে বঙ্গ রাজ্যের এক রাজপুত্র লঙ্কা (অধুনা শ্রীলঙ্কা) জয় করেন এবং সেই দেশের নতুন নাম রাখেন সিংহল। প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও শ্যামদেশে গিয়ে সেখানে নিজেদের উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন।

খ্রিস্টীয় তৃতীয় থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে মগধ রাজ্য ছিল গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বঙ্গের প্রথম সার্বভৌম রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি একাধিক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত সমগ্র বঙ্গ অঞ্চলটিকে একত্রিত করে একটি সুসংহত সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (অধুনা মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙামাটি অঞ্চল)। তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বঙ্গের ইতিহাসে এক নৈরাজ্যের অবস্থা সৃষ্টি হয়। ইতিহাসে এই সময়টি 'মাৎস্যন্যায়' নামে পরিচিত। এরপর চারশো বছর বৌদ্ধ পাল রাজবংশ এবং তারপর কিছুকাল হিন্দু সেন রাজবংশ এই অঞ্চল শাসন করেন। পাল সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র (অধুনা পাটনা, বিহার) এবং পরে গৌড় (মালদহ জেলা)। সেন সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল নবদ্বীপ (নদিয়া জেলা)। এরপর ভারতে ইসলাম প্রবেশ করলে বঙ্গ অঞ্চলেও ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটে। ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নামে দিল্লি সুলতানির দাস রাজবংশের এক তুর্কি সেনানায়ক সর্বশেষ সেন রাজা লক্ষ্মণ সেনকে পরাস্ত করে বঙ্গের একটি বিরাট অঞ্চল অধিকার করে নেন। এরপর কয়েক শতাব্দী এই অঞ্চল দিল্লি সুলতানির অধীনস্থ সুলতান রাজবংশ অথবা সামন্ত প্রভুদের দ্বারা শাসিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে মুঘল সেনানায়ক ইসলাম খাঁ বঙ্গ অধিকার করেন। যদিও মুঘল সাম্রাজ্যের রাজদরবার সুবা বাংলার শাসকদের শাসনকার্যের ব্যাপারে আধা-স্বাধীনতা প্রদান করেছিলেন। এ অঞ্চলের শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল মুর্শিদাবাদের নবাবদের হাতে। নবাবরাও দিল্লির মুঘল সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গ অঞ্চলে ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ঘটে। এই বণিকেরা এ অঞ্চলে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হন। অবশেষে ১৭৫৭ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পলাশীর যুদ্ধে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্‌দৌলাকে পরাজিত করেন। এর পর সুবা বাংলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানির হস্তগত হয়। ১৭৬৫ সালে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে সেন্ট্রাল প্রভিন্সের (অধুনা মধ্যপ্রদেশ) উত্তরে অবস্থিত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মোহনা থেকে হিমালয় ও পঞ্জাব পর্যন্ত সকল ব্রিটিশ-অধিকৃত অঞ্চল বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অন্তর্ভুক্ত হয়। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে প্রায় ২ কোটি সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটে। ১৭৭২ সালে কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ঘোষিত হয়।

বাংলার নবজাগরণ ও ব্রাহ্মসমাজকেন্দ্রিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্কার আন্দোলন বাংলার সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের সূচনা কলকাতার অদূরেই হয়েছিল। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের শাসনভার কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজশক্তি নিজের হাতে তুলে নেয়। ভারত শাসনের জন্য একটি ভাইসরয়ের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৯০৫ সালে ধর্মীয় বিভাজনের ভিত্তিতে প্রথম বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করে পশ্চিমবঙ্গকে পূর্ববঙ্গ থেকে পৃথক করা হয়। কিন্তু বঙ্গবিভাগের এই প্রয়াস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় এবং ১৯১১ সালে বঙ্গপ্রদেশকে পুনরায় একত্রিত করা হয়। ১৯৪৩ সালে পঞ্চাশের মন্বন্তরে বাংলায় ৩০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের মত বিপ্লবী দলগুলি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে বাংলায় ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। ১৯২০ সাল থেকে এ রাজ্যে বামপন্থী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। সেই ধারা আজও অব্যাহত আছে। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের সময় ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা দ্বিধাবিভক্ত হয়। হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মুসলমানপ্রধান পূর্ববঙ্গ নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে যোগ দেয়। এই অঞ্চলটি পরে পূর্ব পাকিস্তান নামে পরিচিত হয় এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গ থেকে লক্ষ লক্ষ হিন্দু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। এই ব্যাপক অভিবাসনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যা দেখা দেয়। ১৯৫০ সালে দেশীয় রাজ্য কোচবিহারের রাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলে কোচবিহার পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। ১৯৫৫ সালে ফরাসি উপনিবেশ চন্দননগর পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়। বিহারের কিছু বাংলা-ভাষী অঞ্চলও এ সময় পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৯৭০ ও ১৯৮০-এর দশকে ব্যাপক বিদ্যুৎ বিপর্যয়, ধর্মঘট ও সহিংস মার্কস্‌বাদী-নকশালবাদী আন্দোলনের ফলে রাজ্যের শিল্প পরিকাঠামো ভেঙে পড়ে। এর ফলে এক অর্থনৈতিক স্থবিরতার যুগের সূত্রপাত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় এক কোটি শরণার্থী পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেয়। সে সময় নকশাল আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। ১৯৭৪ সালের বসন্ত মহামারী আকার ধারণ করলে রাজ্যে সহস্রাধিক মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৭৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে পরাজিত করে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে রাজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হয়। এরপর তিন দশকেরও বেশি সময় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যে শাসনভার পরিচালনা করে।

১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে ভারত সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার এবং ২০০০ সালে সংস্কারপন্থী নতুন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নির্বাচনের

পর রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত হয়। ২০০৬ সালে হুগলির সিঙ্গুরে টাটা ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে তীব্র গণ-অসন্তোষ দেখা যায়। জমি অধিগ্রহণ বিতর্কে টাটা গোষ্ঠী সিঙ্গুর থেকে কারখানা প্রত্যাহার করে নিলে রাজ্য রাজনীতিতে গভীর প্রভাব পড়ে। ২০০৭ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে একটি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে পুলিশের গুলিতে ১৪ জন মারা গেলে রাজ্য রাজনীতি ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এরপর ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন ও ২০১০ সালের পৌরনির্বাচনে শাসক বামফ্রন্টের আসন সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। অবশেষে ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বিপুল ভোটে পরাজিত হয়ে রাজ্যে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান হয়।

পূর্ব ভারতে হিমালয়ের দক্ষিণে ও বঙ্গোপসাগরের উত্তরে এক সংকীর্ণ অংশে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। রাজ্যের সর্ব উত্তরে অবস্থিত দার্জিলিং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল পূর্ব হিমালয়ের একটি অংশ। পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সান্দাকফু (৩,৬৩৬ মিটার বা ১১,৯২৯ ফুট) এই অঞ্চলে অবস্থিত। এই পার্বত্য অঞ্চলকে দক্ষিণে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে সংকীর্ণ তরাই অঞ্চল। অন্যদিকে রাঢ় অঞ্চল গাঙ্গেয় ব-দ্বীপকে বিচ্ছিন্ন করেছে পশ্চিমের মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চল থেকে। রাজ্যের সর্বদক্ষিণে একটি নাতিদীর্ঘ উপকূলীয় সমভূমিও বিদ্যমান। অন্যদিকে সুন্দরবন অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ অরণ্য গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য।

পশ্চিমবঙ্গের প্রধান নদী গঙ্গা রাজ্যকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে। এ নদীর একটি শাখা পদ্মা নাম ধারণ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে; অপর শাখাটি ভাগীরথী ও হুগলি নামে পশ্চিমবঙ্গের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। তিস্তা, তোর্ষা, জলঢাকা, ফুলহার ও মহানন্দা উত্তরবঙ্গের প্রধান নদ-নদী। পশ্চিমের মালভূমি অঞ্চল থেকে উৎপন্ন নদ-নদীগুলির মধ্যে প্রধান হল দামোদর, অজয় ও কংসাবতী। গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ ও সুন্দরবন অঞ্চলে অজস্র নদ-নদী ও খাঁড়ি দেখা যায়। বেপরোয়া বর্জ্য নিক্ষেপের ফলে গঙ্গার দূষণ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রধান সমস্যা। রাজ্যের অন্তত নয়টি জেলায় আর্সেনিক দূষিত ভৌমজলের সমস্যা রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ গ্রীষ্মপ্রধান উষ্ণ জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। রাজ্যের প্রধান ঋতু চারটি, যেমন: শুষ্ক গ্রীষ্মকাল, আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বা বর্ষাকাল, শরৎকাল ও শীতকাল। ব-দ্বীপ অঞ্চলের গ্রীষ্মকাল আর্দ্র হলেও, পশ্চিমের উচ্চভূমি অঞ্চলে উত্তর ভারতের মত শুষ্ক গ্রীষ্মকাল। রাজ্যে গ্রীষ্মকালের গড় তাপমাত্রা ৩৮° সেলসিয়াস (১০০° ফারেনহাইট) থেকে ৪৫° সেলসিয়াস (১১৩° ফারেনহাইট)। রাত্রিকালে বঙ্গোপসাগর থেকে শীতল আর্দ্র দক্ষিণা বায়ু বয়। গ্রীষ্মের শুরুতে স্বল্পস্থায়ী বৃষ্টিপাতের সঙ্গে যে প্রবল ঝড়, বজ্রপাত ও শিলাবৃষ্টি হয় তা কালবৈশাখী নামে পরিচিত। বর্ষাকাল স্থায়ী হয় জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। ভারত মহাসাগরীয় মৌসুমি বায়ুর বঙ্গোপসাগরীয় শাখাটি উত্তরপশ্চিম অভিমুখে ধাবিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গে বৃষ্টিপাত ঘটায়। রাজ্যে শীতকাল (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) আরামদায়ক। এই সময় রাজ্যের সমভূমি অঞ্চলের গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হয় ১৫° সেলসিয়াস (৫৯° ফারেনহাইট)। শীতকালে শুষ্ক শীতল উত্তুরে বাতাস বয়। এই বায়ু তাপমাত্রার সঙ্গে সঙ্গে আর্দ্রতার মাত্রাও কমিয়ে দেয়। যদিও দার্জিলিং হিমালয় পার্বত্য অঞ্চলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে। এ সময়ে এ অঞ্চলের কোথাও কোথাও তুষারপাতও হয়।

পশ্চিমবঙ্গ জৈব বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। এর প্রধান কারণ হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল থেকে উপকূলীয় সমভূমি পর্যন্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য। রাজ্যের ভৌগোলিক এলাকার মাত্র ১৪ শতাংশ বনভূমি; যা জাতীয় গড় ২৩ শতাংশের চেয়ে অনেকটাই কম। রাজ্যের আয়তনের ৪ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকা। বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য সুন্দরবনের একটি অংশ পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত।

উদ্ভিজ্জভৌগোলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়, যেমন: গাঙ্গেয় সমভূমি ও সুন্দরবনের লবণাক্ত ম্যানগ্রোভ অরণ্যভূমি। গাঙ্গেয় সমভূমির পললমৃত্তিকা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত এই অঞ্চলকে বিশেষভাবে উর্বর করে তুলেছে। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের উদ্ভিদপ্রকৃতি পার্শ্ববর্তী ঝাড়খণ্ডের ছোটনাগপুর মালভূমির উদ্ভিদপ্রকৃতির সমরূপ। এ অঞ্চলের প্রধান অর্থকরী বৃক্ষ হল শাল। পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় অঞ্চলের উদ্ভিদপ্রকৃতি উপকূলীয় ধরনের। এ অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ হল ঝাউ। সুন্দরবন অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান বৃক্ষ সুন্দরী গাছ। এই গাছ এই অঞ্চলের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যায় এবং সুন্দরবনের নামকরণও এই গাছের নামেই হয়েছে। উত্তরবঙ্গের উদ্ভিদপ্রকৃতির প্রধান তারতম্যের কারণ এ অঞ্চলের উচ্চতা ও বৃষ্টিপাত। উদাহরণস্বরূপ, হিমালয়ের পাদদেশে ডুয়ার্স অঞ্চলে ঘন শাল ও অন্যান্য ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বন দেখা যায়। আবার ১০০০ মিটার উচ্চতায় উদ্ভিদের প্রকৃতি উপক্রান্তীয়। ১,৫০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত দার্জিলিঙে ওক, কনিফার, রডোডেনড্রন প্রভৃতি গাছের নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলীয় অরণ্য দেখা যায়।

সুন্দরবন বাঘ সংরক্ষণ প্রকল্পের জন্য বিখ্যাত। রাজ্যে মোট ছয়টি জাতীয় উদ্যান আছে– সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান, বক্সা জাতীয় উদ্যান, গোরুমারা জাতীয় উদ্যান, নেওড়া উপত্যকা জাতীয় উদ্যান, সিঙ্গালীলা জাতীয় উদ্যান ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান। রাজ্যের অন্যান্য বন্যপ্রাণীর মধ্যে ভারতীয় গণ্ডার, এশীয় হাতি, হরিণ, বাইসন, চিতাবাঘ, গৌর ও কুমির উল্লেখযোগ্য। রাজ্যের পক্ষীজগৎও বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। পরিযায়ী পাখিদের শীতকালে এ রাজ্যে আসতে দেখা যায়। সিঙ্গালীলা জাতীয় উদ্যানের মত উচ্চ পার্বত্য বনভূমি অঞ্চলে বার্কিং ডিয়ার, রেড পান্ডা, চিঙ্কারা, টাকিন, সেরো, প্যাঙ্গোলিন, মিনিভেট, কালিজ ফেজান্ট প্রভৃতি বন্যপ্রাণীর সন্ধান মেলে। বেঙ্গল টাইগার ছাড়া সুন্দরবন অঞ্চলে গঙ্গা নদী শুশুক, নদী কচ্ছপ, স্বাদুপানির কুমির ও লোনা পানির কুমির প্রভৃতি বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির বন্যপ্রাণীও দেখা যায়। ম্যানগ্রোভ অরণ্য প্রাকৃতিক মৎস্য উৎপাদন কেন্দ্রের কাজও করে। এখানে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় মাছ দেখা যায়।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র বিদ্যমান। রাজ্যের সকল নাগরিকের জন্য সার্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা বিধানসভা নামে পরিচিত। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে এই বিধানসভা গঠিত। বিধানসভার সদস্যরা একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষকে নির্বাচিত করেন। অধ্যক্ষ অথবা (অধ্যক্ষের অনুপস্থিতিতে) উপাধ্যক্ষ বিধানসভা অধিবেশনে পৌরহিত্য করেন। কলকাতা হাইকোর্ট ও অন্যান্য নিম্ন আদালত নিয়ে রাজ্যের বিচারবিভাগ গঠিত। শাসনবিভাগের কর্তৃত্বভার ন্যস্ত রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভার উপর। রাজ্যপাল রাজ্যের আনুষ্ঠানিক প্রধান হলেও, প্রকৃত ক্ষমতা সরকারপ্রধান মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই ন্যস্ত।

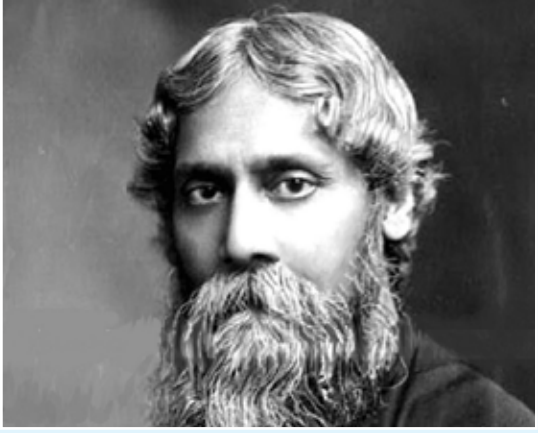

রাজ্যপাল নিয়োগ করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন; এবং মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপালই অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করে থাকেন। মন্ত্রিসভা বিধানসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা এককক্ষীয়। এই সভার সদস্য সংখ্যা ২৯৫ জন; এঁদের মধ্যে ২৯৪ জন নির্বাচিত এবং একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায় থেকে মনোনীত। বিধানসভার সদস্যদের বিধায়ক বলা হয়। বিধানসভার স্বাভাবিক মেয়াদ পাঁচ বছর; তবে মেয়াদ শেষ হবার আগেও বিধানসভা ভেঙে দেওয়া যায়। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাগুলি যথাক্রমে পঞ্চায়েত ও পুরসভা নামে পরিচিত। এই সকল সংস্থাও নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় ৪২ জন ও উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় ১৬ জন সদস্য প্রতিনিধিত্ব করেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে দুই প্রধান প্রতিপক্ষ শক্তি হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কস্‌বাদী)-র নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ও সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২৩৫টি আসন দখল করে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসে। এর আগে বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্ব দেন প্রখ্যাত বামপন্থী নেতা জ্যোতি বসু। দীর্ঘ ৩৪ বছর বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গ শাসন করে। এই সরকার ছিল বিশ্বের দীর্ঘতম মেয়াদের গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কমিউনিস্ট সরকার। ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ২২৬টি আসন দখল করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস-জাতীয় কংগ্রেস জোট বামফ্রন্টকে পরাজিত করে পশ্চিমবঙ্গে সরকার গঠন করছে।

পশ্চিমবঙ্গে মোট ২০টি জেলা। প্রতিটি জেলার শাসনভার একজন জেলাশাসক বা জেলা কালেক্টরের হাতে ন্যস্ত। তিনি 'ইন্ডিয়ান এডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিস' (আইএএস) বা 'ওয়েস্ট বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস' (ডব্লিউবিসিএস)-এর নিযুক্ত কর্মকর্তা। প্রতিটি জেলা একাধিক মহকুমায় বিভক্ত। মহকুমার শাসনভার মহকুমা-শাসকের হাতে ন্যস্ত। মহকুমাগুলি আবার ব্লকে বিভক্ত। ব্লকগুলি গঠিত হয় পঞ্চায়েত ও পুরসভা নিয়ে।

কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং বৃহত্তম শহর। কলকাতা ভারতের তৃতীয় বৃহৎ মহানগর এবং বৃহত্তর কলকাতা দেশের তৃতীয় বৃহত্তম নগরাঞ্চল। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি রাজ্যের অপর এক অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন মহানগর। শিলিগুড়ি করিডোরে অবস্থিত এ শহর উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে অবশিষ্ট দেশের সংযোগ রক্ষা করছে। আসানসোল ও দুর্গাপুর রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের শিল্পতালুকে অবস্থিত অপর দুটি মহানগর। রাজ্যের অন্য শহরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাওড়া, রানীগঞ্জ, হলদিয়া, জলপাইগুড়ি, খড়গপুর, বর্ধমান, দার্জিলিং, মেদিনীপুর, তমলুক, ইংরেজ বাজার ও কোচবিহার।

পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। রাজ্যের প্রধান খাদ্যফসল হল ধান। অন্যান্য খাদ্যফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ডাল, তৈলবীজ, গম, তামাক, আখ ও আলু। এ অঞ্চলের প্রধান পণ্যফসল হল পাট। চা উৎপাদনও বাণিজ্যিকভাবে করা হয়ে থাকে; উত্তরবঙ্গ দার্জিলিং ও অন্যান্য উচ্চ মানের চায়ের জন্য বিখ্যাত। রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের প্রধান উৎস হল চাকরিক্ষেত্র; এই ক্ষেত্র থেকে রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ৫১ শতাংশ আসে; অন্যদিকে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্র থেকে আসে যথাক্রমে ২৭ ও ২২ শতাংশ। রাজ্যের শিল্পকেন্দ্রগুলি কলকাতা ও পশ্চিমের খনিজসমৃদ্ধ উচ্চভূমি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। দুর্গাপুর-আসানসোল কয়লাখনি অঞ্চলে রাজ্যের প্রধান প্রধান ইস্পাত কেন্দ্রগুলি অবস্থিত। ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্যাদি, ইলেকট্রনিকস, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, কেবল, ইস্পাত, চামড়া, বস্ত্র, অলংকার, যুদ্ধজাহাজ, অটোমোবাইল, রেলওয়ে কোচ ও ওয়াগন প্রভৃতি নির্মাণশিল্প রাজ্যের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

স্বাধীনতার বেশ কয়েক বছর পরও খাদ্যের চাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী ছিল। তবে ১৯৮০-এর দশক থেকে রাজ্যে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদিত হয়ে থাকে।

২০০৩-২০০৪ সালের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থব্যবস্থা। রাজ্যের নিট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ২১.৫ মার্কিন ডলার। ২০০১-২০০২ সালে রাজ্যের গড় রাজ্য অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ছিল ৭.৮ শতাংশেরও বেশি যা জাতীয় জিডিপি বৃদ্ধির হারকেও ছাপিয়ে যায়। রাজ্য প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই বিনিয়োগ মূলত আসে সফটওয়্যার ও ইলেকট্রনিকস ক্ষেত্রে। কলকাতা বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। কলকাতা তথা রাজ্যের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির দৌলতে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দেশের তৃতীয় দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থব্যবস্থা। যদিও এ কৃষিভিত্তিক রাজ্যে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রশ্নে নানা বিতর্ক রয়েছে। ন্যাসকম-গার্টনার পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎ পরিকাঠামোকে দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ভূতল সড়কপথের মোট দৈর্ঘ্য ৯২,০২৩ কিলোমিটার (৫৭,১৮০ মাইল)। এর মধ্যে জাতীয় সড়ক ২,৩৭৭ কিলোমিটার (১,৪৭৭ মাইল) এবং রাজ্য সড়ক ২,৩৯৩ কিলোমিটার (১,৪৮৭ মাইল)। পশ্চিমবঙ্গের বাস পরিষেবা অপর্যাপ্ত। রাজ্যে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩,৮২৫ কিলোমিটার (২,৩৭৭ মাইল)। ভারতীয় রেলের পূর্ব রেল ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলক্ষেত্র দু'টির সদর কলকাতায় অবস্থিত। রাজ্যের উত্তরভাগের রেলপথ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের অন্তর্গত। কলকাতা মেট্রো ভারতের প্রথম ভূগর্ভস্থ মেট্রো রেল পরিষেবা। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের অংশ দার্জিলিং হিমালয়ান রেল ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃত।

পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর কলকাতার নিকটবর্তী উত্তর চব্বিশ পরগনার দমদমে অবস্থিত। শিলিগুড়ির নিকটবর্তী বাগডোগরা বিমানবন্দর রাজ্যের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর; সাম্প্রতিককালে এটিকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানবন্দর হল কোচবিহার বিমানবন্দর। এটি বৃহত্তর অসম-বাংলা সীমান্ত এলাকায় পরিষেবা দেয়।

কলকাতা বন্দর পূর্ব ভারতের একটি প্রধান নদীবন্দর। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্ট কলকাতা ও হলদিয়া ডকের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কলকাতা বন্দর থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ার পর্যন্ত যাত্রী পরিবহন পরিষেবা ও ভারত ও বহির্ভারতের বন্দরগুলিতে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মাধ্যমে পণ্য পরিবহন পরিষেবা চালু আছে। রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে, বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলে নৌকা পরিবহনের প্রধান মাধ্যম। কলকাতা ভারতের একমাত্র শহর যেখানে আজও ট্রাম গণপরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। এই পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি।

২০১১ সালের জনগণনার তাৎক্ষণিক ফলাফল অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা ৯১,৩৪৭, ৭৩৬ (ভারতের মোট জনসংখ্যার ৭.৫৫%)। জনসংখ্যার ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গ ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম রাজ্য। জনসংখ্যার

সিংহভাগই বাঙালি। মাড়োয়ারি, বিহারি ও ওড়িয়া সংখ্যালঘুরা রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাস করে। দার্জিলিং পার্বত্য অঞ্চলে শেরপা ও তিব্বতিদের দেখা যায়। দার্জিলিঙে নেপালি গোর্খা জাতির লোকও প্রচুর সংখ্যায় বাস করে। পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতাল, কোল, রাজবংশী ও টোটো আদিবাসীরাও বাস করে। রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় চীনা, তামিল, গুজরাতি, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, আর্মেনিয়ান, পঞ্জাবি ও পারসি সংখ্যালঘুদেরও খুব অল্প সংখ্যায় বাস করতে দেখা যায়। ভারতের একমাত্র চায়না টাউনটি পূর্ব কলকাতায় অবস্থিত।

রাজ্যের সরকারি ভাষা বাংলা ও ইংরেজি। দার্জিলিং জেলার তিনটি মহকুমায় সরকারি ভাষা হল নেপালি। ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে, ভাষাগত জনসংখ্যার বৃহত্তম থেকে ক্ষুদ্রতম ক্রম অনুযায়ী ভাষাগুলি হল বাংলা, হিন্দি, সাঁওতালি, উর্দু, নেপালি ও ওড়িয়া। রাজ্যের কোন কোন অংশে রাজবংশী ও হো ভাষাও প্রচলিত।

২০০১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, হিন্দুধর্ম পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ধর্মবিশ্বাস। হিন্দুধর্মাবলম্বীরা রাজ্যের জনসংখ্যার মোট ৭২.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ইসলাম দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্মবিশ্বাস এবং বৃহত্তম সংখ্যালঘু ধর্ম। মুসলমানরা রাজ্যের জনসংখ্যার মোট ২৫.২ শতাংশ। শিখ, খ্রিস্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা জনসংখ্যার অবশিষ্ট অংশ। পশ্চিমবঙ্গের জনঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯০৪ জন। এই রাজ্য জনঘনত্বের বিচারে ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারী।

পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার ৭৭.০৮%, যা জাতীয় গড় ৭৪.০৪%-এর চেয়ে বেশি। ১৯৯১-১৯৯৫ সালের তথ্য থেকে জানা যায়, এই রাজ্যের মানুষের গড় আয়ু ৬৩.৪ বছর, যা জাতীয় স্তরের গড় আয়ু ৬১.৭ বছরের থেকে কিছু বেশি। রাজ্যের ৭২ শতাংশ মানুষ বাস করেন গ্রামাঞ্চলে।

রাজ্যে অপরাধের হার প্রতি এক লক্ষে ৮২.৬; যা জাতীয় হারের অর্ধেক। ভারতের ২৯টি রাজ্য ও ৭টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে এই হার চতুর্থ নিম্নতম। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের প্রথম রাজ্য যেটি নিজস্ব মানবাধিকার কমিশন গঠন করেছিল।

বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ ও প্রাচীন ঐতিহ্যের বাহক। বাংলা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের (দশম-দ্বাদশ শতাব্দী) কবিরা পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় অঞ্চলের কথ্য ভাষারীতিকে সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের দ্বিতীয় প্রাচীনতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন (পঞ্চদশ শতাব্দী) কাব্যের রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন অধুনা বাঁকুড়া জেলার ছাতনার বাসিন্দা। মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্য ধারাতেও রাঢ়ের বহু কবির রচনা পাওয়া যায়। মনসামঙ্গল ধারার কবি নারায়ণ দেব পূর্ববঙ্গের কিশোরগঞ্জ অঞ্চলের বাসিন্দা হলেও আদতে রাঢ়বঙ্গের মানুষ ছিলেন। এই ধারার কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ছিলেন গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলের বাসিন্দা। চণ্ডীমঙ্গল ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ছিলেন বর্ধমান জেলার দামুন্যা গ্রামের অধিবাসী।

এই সাহিত্যের নিদর্শন মঙ্গলকাব্য, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ঠাকুরমার ঝুলি ও গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলি। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহাশ্বেতা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী প্রমুখ সাহিত্যিকের হাত ধরে।

বাংলা সংগীতের এক স্বতন্ত্র ঐতিহ্যবাহী ধারা হল বাউল গান। লোকসঙ্গীতের অন্যান্য বিশিষ্ট ধারাগুলি হল গম্ভীরা ও ভাওয়াইয়া। অন্যদিকে বাংলা ধর্মসঙ্গীতের দুটি জনপ্রিয় ধারা হল কীর্তন ও শ্যামাসংগীত। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুর শহর হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের বিষ্ণুপুরী ঘরানার প্রধান কেন্দ্র। রবীন্দ্রসংগীত ও নজরুলগীতি অত্যন্ত জনপ্রিয় দুটি সঙ্গীত ধারা। অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত ধারাগুলির মধ্যে অতুলপ্রসাদী, দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্তের গান ও বাংলা আধুনিক গান উল্লেখযোগ্য। ১৯৯০-এর দশকে বাংলা লোকসঙ্গীত ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের সংমিশ্রণে বাংলা গানের এক নতুন যুগের সূত্রপাত ঘটে। এই গান জীবনমুখী গান নামে পরিচিত। বাংলার নৃত্যকলায় মিলন ঘটেছে আদিবাসী নৃত্য ও ভারতীয় ধ্রুপদি নৃত্যের। পুরুলিয়ার ছৌ নাচ এক দুর্লভ মুখোশনৃত্যের উদাহরণ।

কলকাতার টালিগঞ্জ অঞ্চলে বাংলা চলচ্চিত্রের প্রধান কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ কারণে এই কেন্দ্রটি হলিউডের অনুকরণে 'টলিউড' নামে পরিচিত। বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প আর্ট ফিল্ম বা শিল্পগুণান্বিত চলচ্চিত্রে সমৃদ্ধ। সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, তপন সিংহ, ঋত্বিক ঘটক প্রমুখ বিশিষ্ট পরিচালকের চলচ্চিত্র বিশ্ববন্দিত। সমসাময়িককালের বিশিষ্ট পরিচালকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, গৌতম ঘোষ, অপর্ণা সেন ও অকালপ্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষ।

বাংলা ভারতীয় শিল্পকলার আধুনিকতার পথপ্রদর্শক। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলা হয় আধুনিক ভারতীয় শিল্পকলার জনক। বঙ্গীয় শিল্প ঘরানা ইউরোপীয় রিয়্যালিস্টিক ঐতিহ্যের বাইরে এমন একটি নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল যা ব্রিটিশ সরকারের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার আর্ট কলেজগুলিতে শেখানো হত। এই ধারার অন্যান্য বিশিষ্ট চিত্রকরেরা হলেন গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকিঙ্কর বেইজ ও যামিনী রায়। স্বাধীনতার পরে কলকাতা গোষ্ঠী ও সোসাইটি অফ কনটেম্পোরারি আর্টিস্টস-এর শিল্পীরা ভারতীয় শিল্পকলার জগতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হন।

দুর্গাপূজা পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম উৎসব। শরৎকালে আশ্বিন-কার্তিক মাসে (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর) চারদিনব্যাপী এই উৎসব উদ্‌যাপিত হয়ে

থাকে। পশ্চিমবঙ্গের আরেকটি বহুপ্রচলিত হিন্দু উৎসব কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় দুর্গাপূজার পরবর্তী অমাবস্যা তিথিতে। রাজ্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য হিন্দু উৎসবগুলি হল পয়লা বৈশাখ, অক্ষয় তৃতীয়া, দশহরা, রথযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, বিশ্বকর্মা পূজা, মহালয়া, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, নবান্ন, জগদ্ধাত্রী পূজা, সরস্বতী পূজা, দোলযাত্রা, শিবরাত্রি ও চড়ক-গাজন। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে হুগলি জেলার মাহেশ ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে বিশেষ মেলা ও জনসমাগম হয়ে থাকে। হুগলি জেলার চন্দননগর ও নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা ও জগদ্ধাত্রী বিসর্জন শোভাযাত্রা বিখ্যাত। মকর সংক্রান্তির দিন বীরভূম জেলার কেন্দুলিতে জয়দেব মেলা উপলক্ষ্যে বাউল সমাগম ঘটে। পৌষ সংক্রান্তির দিন হুগলি নদীর মোহনার কাছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গঙ্গাসাগরে আয়োজিত গঙ্গাসাগর মেলায় সারা ভারত থেকেই পুণ্যার্থী সমাগম হয়। ৪ঠা মাঘ বাঁকুড়ার কেঞ্জেকুড়া গ্রামে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে এক বিশাল মুড়ি মেলা হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ির কাছে প্রাচীন জল্পেশ্বর শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে আয়োজিত হয় বিখ্যাত জল্পেশ্বর মেলা। শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সর্পদেবী মনসার পূজা উপলক্ষ্যে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে আয়োজিত হয় ঝাঁপান উৎসব। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের ঝাঁপান উৎসব সবচেয়ে বিখ্যাত। কোচবিহার শহরের মদনমোহন মন্দিরকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত রাসমেলা পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম মেলা।

ইসলামি উৎসব মধ্যে ঈদুজ্জোহা, ঈদুলফিতর, মিলাদ-উন-নবি, শবেবরাত ও মহরম বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। খ্রিস্টান উৎসব বড়দিন ও গুড ফ্রাইডে; বৌদ্ধ উৎসব বুদ্ধপূর্ণিমা; জৈন উৎসব মহাবীর জয়ন্তী এবং শিখ উৎসব গুরু নানক জয়ন্তীও মহা ধুমধামের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সাংস্কৃতিক উৎসবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, পঁচিশে বৈশাখ, নেতাজী জয়ন্তী ইত্যাদি। প্রতি বছর পৌষ মাসে শান্তিনিকেতনে বিখ্যাত পৌষমেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বইমেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উৎসব। আন্তর্জাতিক কলকাতা পুস্তকমেলা রাজ্যের একমাত্র বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বইমেলা। আঞ্চলিক বইমেলাগুলি রাজ্যের সকল প্রান্তেই বছরের নানা সময়ে আয়োজিত হয়। এছাড়া সারা বছরই রাজ্যজুড়ে নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলি রাষ্ট্রীয় অথবা বেসরকারি উদ্যোগে পরিচালিত হয়ে থাকে। বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মীয় সংগঠনও বিদ্যালয় পরিচালনা করে। প্রধানত বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমেই শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত; তবে সাঁওতালি, নেপালি, হিন্দি ও উর্দু ভাষাতেও পঠনপাঠন করার সুযোগ এ-রাজ্যে অপ্রতুল নয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষদ অথবা কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ (সিবিএসসি) অথবা কাউন্সিল ফর ইন্ডিয়ান স্কুল সার্টিফিকেট একজামিনেশন (আইসিএসই) দ্বারা অনুমোদিত। ১০+২+৩ পরিকল্পনায় মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার পর ছাত্রছাত্রীদের দুই বছরের জন্য প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় জুনিয়র কলেজে পড়াশোনা করতে হয়। এছাড়াও তারা পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ অথবা কোন কেন্দ্রীয় বোর্ড অনুমোদিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়েও প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পড়াশোনা করতে পারে। এই ব্যবস্থায় তাদের কলা, বাণিজ্য অথবা বিজ্ঞানবিভাগের যে-কোন একটি ধারা নির্বাচন করে নিতে হয়। এই পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করার পরই তারা সাধারণ বা পেশাদার স্নাতক স্তরের পড়াশোনা করতে পারে।

২০০৬ সালের হিসেব অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আঠারো। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম ও অন্যতম বৃহৎ আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রয়েছে প্রায় ২০০টি কলেজ। বেঙ্গল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যের দুটি প্রসিদ্ধ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। শান্তিনিকেতনে অবস্থিত বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (কলকাতা), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় (বর্ধমান), বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় (বাঁকুড়া), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (মেদিনীপুর), উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় (রাজা রামমোহনপুর, শিলিগুড়ি), বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় (কল্যাণী, নদিয়া), পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরও তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়– আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতিসম্পন্ন রাজ্যের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, খড়্গপুর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট, কলকাতা, জাতীয় প্রযুক্তি সংস্থান, দুর্গাপুর (পূর্বতন আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ), ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিক্যাল সায়েন্সেস, ভারতীয় বিজ্ঞান শিক্ষা ও অনুসন্ধান সংস্থান, কলকাতা ও ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউশন।

২০০৫ সালের হিসেব অনুসারে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের সংখ্যা ৫০৫। এগুলির মধ্যে ৩৮৯টি বাংলা সংবাদপত্র। কলকাতা থেকে প্রকাশিত *আনন্দবাজার পত্রিকা* ভারতে একক-সংস্করণে সর্বাধিক বিক্রিত বাংলা পত্রিকা। এই পত্রিকার দৈনিক গড় বিক্রির পরিমাণ ১,২৩৪,১২২টি কপি। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বাংলা সংবাদপত্রগুলি হল *আজকাল*, *বর্তমান*, *সংবাদ প্রতিদিন*, *উত্তরবঙ্গ সংবাদ*, *জাগো বাংলা*,

দৈনিক স্টেটসম্যান ও *গণশক্তি*। *দ্য টেলিগ্রাফ*, *দ্য স্টেটসম্যান*, *এশিয়ান এজ*, *হিন্দুস্তান টাইমস* ও *দ্য টাইমস অফ ইন্ডিয়া* কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ইংরেজি দৈনিকের নাম। এছাড়াও হিন্দি, গুজরাটি, ওড়িয়া, উর্দু ও নেপালি ভাষাতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে।

দূরদর্শন পশ্চিমবঙ্গের সরকারি টেলিভিশন সম্প্রচারক। এছাড়া কেবল টেলিভিশনের মাধ্যমে মাল্টিসিস্টেম অপারেটররা বাংলা, নেপালি, হিন্দি, ইংরেজিসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চ্যানেল সম্প্রচার করে থাকে। বাংলা ভাষায় সম্প্রচারিত ২৪ ঘণ্টার বাংলা টেলিভিশন সংবাদ চ্যানেলগুলি হল *স্টার আনন্দ*, *কলকাতা টিভি*, *২৪ ঘণ্টা*, *এনই বাংলা*, *নিউজ টাইম*, *চ্যানেল টেন*, *আর-প্লাস* ও *তারা নিউজ*; ২৪ ঘণ্টার টেলিভিশন বিনোদন চ্যানেলগুলি হল *স্টার জলসা*, *ইটিভি বাংলা*, *জি বাংলা*, *আকাশ বাংলা* ইত্যাদি। এছাড়া *চ্যানেল এইট টকিজ* নামে একটি ২৪ ঘণ্টার চলচ্চিত্র চ্যানেল এবং *তারা মিউজিক* ও *সঙ্গীত বাংলা* নামে দুটি ২৪ ঘণ্টার সংগীত চ্যানেলও দৃষ্ট হয়। *আকাশবাণী* পশ্চিমবঙ্গের সরকারি বেতার কেন্দ্র। বেসরকারি এফএম স্টেশন কেবলমাত্র কলকাতা, শিলিগুড়ি ও আসানসোল শহরেই দেখা যায়। বিএসএনএল, ইউনিনর, টাটা ডোকোমো, আইডিয়া সেলুলার, রিলায়েন্স ইনফোকম, টাটা ইন্ডিকম, ভোডাফোন এসার,এয়ারসেল ও এয়ারটেল সেলুলার ফোন পরিষেবা দিয়ে থাকে। সরকারি সংস্থা বিএসএনএল ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা থেকে ব্রডব্যান্ড ও ডায়াল-আপ অ্যাকসেস ইন্টারনেট পরিষেবা পাওয়া যায়।

ক্রিকেট ও ফুটবল এ রাজ্যের দুটি জনপ্রিয় খেলা। কলকাতা ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল ও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মত দেশের প্রথম সারির জাতীয় ক্লাবগুলি রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। খো খো, কবাডি প্রভৃতি দেশীয় খেলাও এখানে খেলা হয়ে থাকে। ক্যালকাটা পোলো ক্লাব বিশ্বের প্রাচীনতম পোলো ক্লাব বলে পরিগণিত। অন্যদিকে রয়্যাল ক্যালকাটা গলফ ক্লাব গ্রেট ব্রিটেনের বাইরে এ ধরনের ক্লাবগুলির মধ্যে প্রথম।

পশ্চিমবঙ্গে একাধিক সুবৃহৎ স্টেডিয়াম অবস্থিত। সারা বিশ্বে যে দুটি মাত্র লক্ষ-আসন বিশিষ্ট ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে কলকাতার ইডেন গার্ডেনস তার অন্যতম। অন্যদিকে বিধাননগরের বহুমুখী স্টেডিয়াম যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুটবল স্টেডিয়াম। ক্যালকাটা ক্রিকেট অ্যান্ড ফুটবল ক্লাব বিশ্বের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব। পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বেরা হলেন প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, অলিম্পিক টেনিস ব্রোঞ্জ পদকজয়ী লিয়েন্ডার পেজ, দাবা আন্তর্জাতিক গ্র্যান্ড মাস্টার দিব্যেন্দু বড়ুয়া প্রমুখ।

• সূত্র ইন্টারনেট

ভারতীয় রান্না

বাঙালির রান্নাঘর

জা মা ই ষ ষ্ঠী

কথায় বলে, বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। মারী-মড়ক-মন্বন্তর কিংবা রাজনৈতিক দুর্যোগের ঘনঘটা বাঙালির জীবনকে আচ্ছন্ন করলেও ভাটা পড়েনি তার অফুরান আনন্দযজ্ঞে। নানা রঙে সে তার উৎসবমুখর দিনের আনন্দঘন মুহূর্তগুলিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়েছে জীবনের সুবিস্তৃত আঙিনায়। এর কারণ একটাই, বাঙালি উৎসবপ্রিয় জাতি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।'... 'আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি'– এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ। উৎসবপ্রাণ বাঙালি ঐ কল্যাণী ইচ্ছা পোষণ করে বলেই আর পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে উৎসবে মাতে। গড়ে তোলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক। বাংলার উৎসবগুলিকে প্রধানত চার শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়– ১. ঋতু উৎসব, ২. ধর্মীয় উৎসব, ৩. সামাজিক উৎসব এবং ৪. জাতীয় উৎসব।

জামাইষষ্ঠী মূলত একটি সামাজিক উৎসব। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে শ্বশুর-শাশুড়িরা জামাইদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। এই নির্দিষ্ট দিনটি বাংলা দিনপঞ্জীতে জামাইদের জন্য উৎসর্গিত। জামাইদের মঙ্গল ও দীর্ঘায়ু কামনায় শাশুড়িরা ষষ্ঠী দেবীর পূজা দেন এবং জামাইদের চন্দনের ফোঁটা ও ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। কোথাও আবার জামাইদের ডান হাতে হলুদ তাগা (এক প্রকার টুকরো কাপড়) বেঁধে দেওয়ার রীতি আছে। তারপর জামাইদের বিভিন্ন ফল মিষ্টি ও অনেক রকম পদ রান্না করে খাওয়ানো হয়। শুধুমাত্র জামইদের অনুষ্ঠান হলেও পরিবারের সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার লোকাচার ভেদে অনুষ্ঠানের ধরনের বদল হয়। এই ষষ্ঠী কোথাও আবার 'অরণ্য ষষ্ঠী' নামে পরিচিত।

জামাই জোড়াইলিশ আর ধুতির কোঁচা ঝুলিয়ে শ্বশুরবাড়ি রওনা দিয়েছে কিংবা শ্বশুরবাড়ির দেওয়া নতুন কাপড়-চোপড় পরে বসেছে শ্বশুর-শাশুড়ির আশীর্বাদ নিতে– এমন দৃশ্য শিহরন জাগায় মনে। আনুষ্ঠানিকতা শেষে আসে উৎসবের আসল পর্ব ভূরিভোজ। আজকাল জামাইকে পাত পেড়ে খাওয়ানোর সনাতন রীতি অনেকটাই বদলে যাচ্ছে। বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁয় এখন জামাই আপ্যায়নের ব্যবস্থা হচ্ছে কিছু কড়ি ফেললেই। • নিজস্ব প্রতিনিধি

স্বপ্নের কোন নিজস্ব রঙ নেই

সুমন রায়হান

কৃষ্ণচূড়ার আচ্ছন্ন লাল মাতাল
মৌ-এর নেশায় বুদ!
পুরনো অসুখ আবার এসেছে ফিরে
তুমি ডেকেছিলে কাল ভৈরবের তীরে।
সোনাঝরা বিকেল বহুদিন বৃষ্টি নেই!
কতকাল এ দৃষ্টিতে তোমার দৃষ্টি নেই
স্বপ্নের কোন নিজস্ব রঙ নেই;
আমি কেবল মৃত্যুর আলপনা আঁকি,
কৃষ্ণচূড়ার লাল থেকে–
আমায় ধার দেবে কিছু স্বপ্ন?
আরো কিছুদিন বাঁচতে চাই...
ঋণী হতে চাই বারবার
মৈত্রী ও মৃত্যুর কাছে...

অফিসপাড়ার পাখি

মিতুল সাইফ

অফিস দারোয়ান থেকে বড়বাবু
সকলেই গন্ধ শোঁকে তার।
গাছের কোটরে, লতায় পাতায়
শেকড়ে বাকড়ে, সব ভাঁজে ভাঁজে
শত জোড়া চোখ গিলে খেতে চায়,
ছিঁড়ে নিতে চায় সব।

উপায় ছিল না কোন।
টানাপোড়েনের সংসারে বড়
খিদে খিদে জ্বালাতন।
তবু ঢেকে ঢেকে ছবি এঁকে এঁকে
একদিন এক ঝড়ে ভেঙে যায় ডাল।
পাতা ঝরে যায়
ডোবার পানিতে ভাসে।
তার বা তাদের নামে জি ডি নেই
থানার দেয়ালে নেই বাবুদের ছবি।
অফিস পাড়ার মেয়ে।
কেউ কেউ তাকে নষ্টা বলেছিল।

মগ্ন জলের মন্দিরা

রহিমা আখতার কল্পনা

ভরা বরষায় তাপিত শরীর ভেজে মন্থর বৃষ্টিতে
উতল জোয়ারে মন মজে আছে ওই দুরন্ত ইষ্টিতে।

বরষা-কুহকে বাজে রিমিঝিম মগ্ন জলের মন্দিরা
অভিমান ভুলে চুপে কথা বলে মৃদু সুমন্ত সন্ধিরা।

কেঁদে ফিরে যায় তরুণ তাপস, তবু আনন্দী ঘুমন্ত
দেখেও দ্যাখে না ভেসে গেছে পাড়, মন-সীমান্ত ডুবন্ত।

ভাঁটফুল ফোটে, বৃষ্টির সূঁচ বেঁধে যেন তার অন্তরে
কাঁপছে পাপড়ি পেলব শীতল, মৃদু হাসে কোন্ মন্তরে !

থিরথির কাঁপে আকন্দ ঝাড় গহীন গোপন আনন্দে
বরষা-বিভোর মাঝ দুপুরেও তমসা নামছে সানন্দে।

বীজের গভীরে ঘুমভাঙা চোখে পৃথিবীর ছায়া স্পন্দিত
শেকড়ে আশার ওম লেগে আছে, আগামীর পথ নন্দিত।

জলের আদরে দলিত ফুলেরা– মরে বাঁচি তবু শ্রাবন্তী
উদাসী শ্রমণ, তারো ভেজে মন বুঝে গেছে গৃহী সীমন্তী।

এস ধারাজল, জ্বলছে অনল ধ্যানীর বুকের অন্দরে
ধূমল ঝড়েই ঢালো সোমরস ধূ ধূ রোদজ্বলা বন্দরে।

ধানবন

দুলাল সরকার

চল, ঝিলের দিকে যাই... নীলকণ্ঠী পাখিরা ডাকছে
ঝাঁক ঝাঁক কচুরির চাকে নীল সাদা ফুল
আমন পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়ে নীরব
শীতল বাতাস, দূরে সাদা কাশফুল...উপরে
নীলকণ্ঠ আকাশ, সমুদ্র মন্থন শেষে উঠে আসা
নীল বিষ কণ্ঠে ধারণ করে শিব এখন পৃথিবীর অমরত্ব
লাভ করেছে... চল আমাদের খুচরো জীবন, ওখানে কেউ নেই
আলোক ছড়ানো সুদূর দিগন্তে কি অতুলনীয়
গম্ভীর নীলাকাশ... পল্লবময়, অনেকটা পথ পেরিয়ে
স্থবির আনন্দ আশ্রম হঠাৎ ঋতু পরিবর্তনের
দায় নিয়ে সর্বংসহা সন্ধ্যা ঘনালে
অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা আমার আঙুলে লেগে থাকা
তোমার আঙুলের সুগন্ধি প্রলেপ,

তোমার শাড়ি-তোলা হাঁটু অবধি লতিয়ে ওঠা ভিজে জল
পৃথিবী ভুলে ভালবাসা মাখি নিষ্পাপ দু'জনে
বাড়ি থেকে অনেক দূরে এক টুকরো মাটির চিহ্নও নেই যেখানে
শুধু জল আর জল তার উপরে মেঘের মত ভাসমান ধানবন ।

পুনহরা
শিখর চৌধুরী

হলুদ ফুলগুলো আরো হলদে লাগছে,
হলদে আলোর ঝাপটানিতে,
জ্যোৎস্না রসের পরম প্লাবনে,
নিখিল হয়ে উঠছে পরিমিত।

স্বপ্ন-গন্ধ-কল্পনার রূপ ভেলায় চড়ে
ধরণীকে গ্রাস করে ফেলেছে পুনহরা;
ভালবাসা বীনে পূর্ণ হল এই ধরা
মধুর অমিত ঝংকারে ঝংকারে।

নস্টালজিয়া
সরওয়ার মুর্শেদ

সন্তের বৃষ্টিস্নাত
স্মৃতির রমণীরা কখনো কখনো ফিরে আসে
নিমফুল গন্ধের মত
আর্দ্র বাতাসে
তারাও নিমফুল গন্ধ হয়ে যায়
মুহূর্তে হারায়–
নাগরিক ক্লেদ-ক্লান্তি যত জমে থাকে শুধু
জীবনের শিরায় শিরায়,

স্মৃতির রমণীরা বাস্তবে ফেরে না কখনো
কখনো কী ফেরে!
কিংবা তারা হয়তো বাস্তব ছিল না কখনো
ছিল না হয়তো রক্তমাংসের;
তবু মনে হয়– তারা সব সত্যি যেন
রূপকথা নয়,
এ এক চরম কুহক
নস্টালজিয়া জীবন শেষের।

কুহু
জামাল আহমেদ

রাতের কুহু ফাগুন একটু
জাগিয়ে গেল,
অথচ অমারাতে ভালবাসতে
কেউ এল না।

নীল খামে চিঠি
জাফরুল আহসান

তোমাকে দিয়েছি ফসলের বীজ চাঁদের কিরণ
তৃষ্ণা অনন্ত মোড়কে জড়ানো সুখের মিলন
তোমাকে দিয়েছি সূর্যের আলো প্রেমের ভুবন
কর্ষিত মাঠে শস্যদানার যাপিত জীবন।

যোগ-বিয়োগের কঠিন হিসেব সন্ধ্যেবেলায়
তীর্যক বাণ হৃদ-মন্দিরে কাঁপন জাগায়
অবিশ্বাসের খোলা তলোয়ার আমাকে শাসায়
প্রাণঘাতী সেও, হুঙ্কারে তার কিবা আসে যায়।

যা কিছু দিয়েছি পেয়েছি কি তার সমপরিমাণ!
রাঙতা জড়ানো নীল খামে চিঠি বড় বেমানান।

আঁকাবাঁকা রেখা
পঙ্কজ সাহা

কতদিন হয়ে গেল
তানজিনার সঙ্গে দেখা হয় না,
হালিমারা এসেছিল
কাল দোয়েল ভোরে,
বগুড়া থেকে নীল চিঠি
রাজশাহীর সুবাতাস
তাদের হাতে হাতে,
একটা আঁকাবাঁকা রেখার
ওধারে দাঁড়িয়ে
শফিকের কথা তালেয়ার কথা
শাহিনের কথা হাফিজের কথা
শোনাল হালিমা,
হালিমারা হাত নাড়ল
রেখার ওপার থেকে,
আমি এপার থেকে শিস দিয়ে বললাম
দোয়েল, ভোর হয়ে গেছে,
ক্লান্ত ডানার শব্দ
ভেসে গেল
এপার থেকে ওপারের আকাশে।

তারপর যে যার মত
সরে এসেছি,
কেবল পড়ে আছে
আঁকাবাঁকা সেই এক রেখা।

পঙ্কজ সাহা ভারতের কবি

কৃতবিদ্য

রে ফু ল ক রি ম

উদীয়মান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী

রেফুল করিম বাংলাদেশের সঙ্গীতাঙ্গনে এক উদীয়মান রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী। সঙ্গীত, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে ইতোমধ্যে তাঁর বেশ কিছু গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তা-চেতনা অক্ষুণ্ন রেখে রবীন্দ্রসঙ্গীতায়োজনে নতুন নতুন ভাবধারার সম্মিলন ঘটিয়েছেন তিনি।

মাত্র চার বছর বয়স থেকে বাবা মুক্তিযোদ্ধা চিত্রশিল্পী সাংবাদিক রেজাউল করিম হান্নান ও মা নৃত্যশিল্পী স্বাধীনতা সংগ্রামী রওশন আরা বেগমের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে রেফুল করিমের সঙ্গীতে হাতেখড়ি। শিলাইদহ কুঠিবাড়ির কাছেই পৈতৃক আবাস হওয়ায় রবীন্দ্রানুরাগের জন্ম সেই ছোটকাল থেকেই।

পরবর্তীকালে কল্লোল সরোয়ার ও ড. রবীন্দ্রনাথ মল্লিকের কাছে প্রাথমিক সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করেন রেফুল। ১৯৯৭ সালে ঢাকায় সরকারি সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়ার সুবাদে সাদী মহম্মদ, রেজওয়ানা চৌধুরী বন্যা এবং পাপিয়া সারোয়ারের মত স্বনামধন্য শিল্পীদের কাছে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষালাভের সুযোগ পান তিনি।

এরপর ২০০২ সালে ভারতের বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের সঙ্গীত ভবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এসময় তিনি স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, গোরা সর্বাধিকারী, বুলবুল বসু, সংঘমিত্রা গুপ্ত, সৌগত ধরচৌধুরী প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন।

বিশ্বভারতীতে পড়াশোনার সময়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি প্রফেসর সুনীল কবিরাজের কাছে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত যন্ত্রে হিন্দুস্থানী মার্গ সঙ্গীত এস্রাজের ওপর তালিম নেন এবং সঙ্গতে পারদর্শিতা লাভ করেন।

রেফুল কলকাতা, নতুনদিল্লি, মুম্বই, পুদুচেরী, আসাম, মেঘালয়, আগরতলা, পাটনাসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন। তাঁর পরিবেশনা ভারতের *দূরদর্শনসহ* নানা টিভি চ্যানেলে সম্প্রচারিত হয়; সরাসরি সঙ্গীত সম্প্রচারিত হয় *ফ্রেন্ডস এফএম রেডিওতে*।

রেফুলের সঙ্গীত প্রথম সম্প্রচারিত হয় বাংলাদেশ টেলিভিশনে ১৯৯৭ সালে। এরপর দেশের অন্যান্য চ্যানেলেও বিভিন্ন সময়ে তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নিয়মিত সঙ্গীত পরিবেশন করেও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন এই তরুণ সঙ্গীতানুরাগী।

২০০৫ সালে ঢাকার *বেঙ্গল ফাউন্ডেশন* থেকে সঙ্গীতের ওপর বৃত্তি পান এবং ২০০৮ সালে ঢাকার *আনোয়ারা বেগম বৃত্তি সমিতি* থেকে সৃজনশীল সঙ্গীতে আরেকটি বৃত্তি লাভ করেন।

২০০৬ সালে ভারতের রাঁচী শহরের পূর্বাঞ্চলীয় যুব উৎসবে বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের প্রতিনিধিত্ব করেন রেফুল। ২০০৭-এ বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতন থেকে সঙ্গীতে স্নাতক এবং ২০০৯ সালে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভের পর দেশে ফিরে রেফুল নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার পাশাপাশি *কনকর্ড শিল্পকলা ভুবন* এবং *বাফায়* সঙ্গীত শিক্ষাদানে নিয়োজিত রয়েছেন। একইসঙ্গে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর লেখালেখি চলছে *বাংলা একাডেমির* নিজস্ব সাময়িকী, *ভারত বিচিত্রা* এবং অন্যান্য প্রকাশনায়। পরিচালনা করছেন ছোটদের নিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গানের দল *শান্তিনিকেতন ধারা*। • নিজস্ব প্রতিনিধি

শিশুতীর্থ

কিচ কিচ কিচ

আহমেদ রিয়াজ

কিচ কিচ কিচ। মুরগিছানাটা ঘুরতে লাগল মা মুরগির চারপাশে। সন্ধে নামব নামব করছে। ঝুপ করে নেমে যাবে যে কোন সময়। খোঁয়াড়ের কাছে চলে এসেছে মা মুরগি। কিন্তু ছানাটার খোঁয়াড়ে ওঠার কোন ইচ্ছেই যেন নেই। পনেরদিন বয়েসী ছানা। গায়ের রঙ হয়েছে একেবারে মায়ের মত। দেখেই বোঝা যায়, বড় হয়ে সুন্দর একটা মোরগ হবে ওটা। মাথার উপর কী সুন্দর ছোট্ট একটা ঝুঁটি। লাল টকটকে। মা মুরগি ছানার দিকে তাকায় আর খুশি হয়। ছানাটার জন্য গর্ব হয় তার। এ তলাটে এত সুন্দর ছানা আর একটাও ওর চোখে পড়েনি। সুন্দরছানা প্রতিযোগিতা হলে নিশ্চিত চ্যাম্পিয়ন হত।

দেখতে না দেখতেই ঝুপ করে সন্ধে নামল। মা মুরগি খোঁয়াড়ে উঠে গেল আগে। ডাকতে লাগল, ককর-রর। করর-কক।

অন্য কোন দিন হলে ছানাটাও মায়ের ডাকে সাড়া দিত, কিচ কিচ কিচ।

কিন্তু আজ দিল না। আজ ও খোঁয়াড়ে উঠবে না। চুপ করে রইল। ওর সাড়া না পেয়ে এরপর মা কী করে, দেখতে চাইল।

মা মুরগি আবারও ডাকল, ককর-ররর। খোঁয়াড়ে উঠে আয় বাছা। তোকে না একদিন বলেছি সন্ধে হলে খোঁয়াড়ের নিচে থাকবি না। কত্ত বিপদ থাকতে পারে। কোন বিড়াল তোকে নিয়ে যেতে পারে মুখে করে। কিংবা কোন বজ্জাত কাক ছোঁ মেরে তোকে নিয়ে চলে যেতে পারে গাছের উপর। তখন? তখন তোকে কোথায় পাব? তুই ছাড়া আমার আর কে আছে?

সত্যিই ও ছাড়া আর কেউ নেই মা মুরগির। ওর আরও ভাই বোন ছিল। আরও চারটা। দুটো গেছে সাদা রঙের একটা বজ্জাত বিড়ালের পেটে। আর দুটোকে নিয়ে গেছে কাক। একেবারে গাছের আগায়। ওখান থেকে আর নিচে নামতে পারেনি ওরা। মা মুরগি অনেক চেষ্টা করেছিল ছানাদের বাঁচাতে কিন্তু পারেনি।

মা মুরগি আবারও ডাকল, জলদি খোঁয়াড়ে উঠে আয় বাছা। রাত হয়ে গেল তো!

মায়ের কথা ছানার কানে যায়নি। ততক্ষণে ও খোঁয়াড় থেকে অনেকখানি দূরে। ওই যে একটা বাড়ি দেখা যায়, ওর কাছে বেশ রহস্যময় মনে হয় বাড়িটাকে। ওর খুব সখ ওই বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখবে। ওই বাড়িতে যারা থাকে, তারাই ওদের খাবার দেয়। সকালে ওদের বাড়ির সদর দরজা খুলে দেয়। একটাই দরজা ওদের খোঁয়াড়ের এবং ওটাই সদর দরজা। ছানাটি নিজের বাড়ির দরজার দিকে না ছুটে ছুটতে থাকে ওই রহস্যময় বাড়ির সদর দরজার দিকে।

ছানার কোন সাড়া না পেয়ে খোঁয়াড় থেকে নেমে আসে মা মুরগি। ইতি উতি তাকায়। হঠাৎ নজরে পড়ে ছানা ছুটে যাচ্ছে ওই বাড়ির দিকে। ওরা যে খোঁয়াড়ে থাকে সেটার মালিক থাকে ওই বাড়িতে।

এক ছুটে ছানার পথ আটকাল মা মুরগি। বলল, কোথায় যাচ্ছিস?

ছানা বলল, ওই বাড়িতে।

মা মুরগি জানতে চাইল, কেন?

ছানা কী একটা উত্তর দিতে চাইল, তার আগেই ওই বাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা মানুষ। দরজার সামনে মুরগিটাকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল, দুষ্ট মুরগি! সন্ধে হয়ে গেছে সেই কখন। এখনও টোঁ টোঁ করছিস? খোঁয়াড়ে ঢোকার নাম নেই। দাঁড়া দেখাচ্ছি মজা।

জানে মুরগি। কী আর মজা দেখাবে? বড়জোর ধাওয়া করবে! ধাওয়া খাওয়া কোন মজা হল নাকি? তারচেয়ে চারটে দানাপানি দিলে না হয় মজা হত। সারারাত খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে। সন্ধের দিকে একবার করে খাবার দিলে কী এমন ক্ষতি! নিজেরা তো ঠিকই রাতের খাবার খায়। ওদের বেলায় কেবল কিপটেমি।

কয়েকবার হুস হুস করল মানুষটা। কিন্তু নড়ল না মুরগি। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। এরপর আরো কাছে এল মানুষ। খপ করে ধরে ফেলল মুরগি। ছানাটা কিন্তু ততক্ষণে ঢুকে গিয়েছে মানুষদের ঘরে। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে মুরগি। ছানাকে নিষেধ করছে ও, ককর-ররর-কক। যাসনে বাছা আমার।

কিন্তু কে শোনে সে কথা। ছানাটি কিচ কিচ করতে করতে ঢুকে গেল ঘরের ভিতর।

প্রথমে যে ঘর পড়ল, সেখানে কয়েকটা আসন। খুব সুন্দর করে সাজানো ঘরটা। ছানাটি ঘাড় ঘুরিয়ে চারপাশ দেখতে লাগল। যতই দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে। ঘরের ভিতর কী যেন একটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ওটার মধ্যে কী সুন্দর ছবি। আরে! ছবিগুলো নড়াচড়াও করছে। মুগ্ধ হয়ে সে ছবি দেখতে লাগল মুরগি ছানা। হঠাৎ একটি বিড়ালকে এগিয়ে আসতে দেখল ও। মা ওকে অনেকবার সাবধান করে দিয়েছিল, বিড়ালের সামনে যাতে না পড়ে। পড়লেই শেষ। ওর দুটো বোনের মত ওকেও চলে যেতে হবে বিড়ালের পেটে।

ছবির বিড়ালটা ওকে ধরার জন্য দৌড়চ্ছে। মুরগি ছানাও ভয় পেয়ে কিচ কিচ করতে লাগল। বুক ধড়ফড় করছে ওর। ছোট্ট বুকটা ওঠানামা করছে। ভয় পেয়ে ঢুকে গেল আরেকটা ঘরে। এ ঘরে একটি মানুষ বসে আছে একটি চেয়ারে। এই মানুষটি ঘরের আর মানুষের চেয়ে কিছুটা ছোট। মাথায় লম্বা লম্বা চুল। কানে দুল পরা। ও একটা মেয়ে। ছোট্ট মেয়ে। কিচ কিচ শব্দ শুনে ছোট্ট মেয়েটি তাকাল ওর দিকে। তারপর এগিয়ে এল ওর দিকে। বলল, বাহ্! কী সুন্দর মুরগির ছানা। মাথায় একটা ঝুঁটিও আছে দেখছি।

তারপর হাতে তুলে নিল। আদর করতে লাগল। পালকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। এমনকি ওর ঝুঁটির মধ্যে একটা চুমুও খেল। খুশিতে কিচ কিচ করে উঠল মুরগি ছানা। ছানাকে টেবিলের উপর রেখে মেয়েটি একটি বইয়ের সঙ্গে বক বক করতে লাগল। কিন্তু বইটা মেয়েটার সঙ্গে কোন কথাই বলল না। কেবল নিজেকে খুলে রেখে পড়ে রইল টেবিলের ওপর। ছানাটি অবাক হল। একা একা কাউকে এত বক বক করতে দেখেনি ও। মেয়েটি যেভাবে সামনে পিছনে দোল খেতে খেতে কথা বলছে, অমন করে কাউকে কখনো কথাও বলতে দেখেনি। বড্ড বিরক্ত লাগল ছানার। নিজে নিজেই কিছুক্ষণ কিচ কিচ করল। কিচ কিচ শুনে মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হাসল কেবল। আবার বক বক করতে লাগল বোবা বইটার সঙ্গে। ছানাটি এবার নিজেই খেলায় মেতে ওঠল। এ ঘরটাই ওর পছন্দ হয়েছে। এ ঘরে কোন ছবি নেই। ছবির কোন বিড়াল নেই যে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ওর ওপর। টেবিলের ওপর কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করল ও। তারপর পাশের বিছানার ওপর লাফ দিল। বিছানায় ছোটাছুটি করল। গড়াগড়ি খেল। একসময় মেয়েটি বকবক থামিয়ে ওকে নিয়ে চলে এল অন্য একটি ঘরে।

এ ঘরে বড় একটা টেবিল। টেবিলের চারপাশে চারটি চেয়ার। তিনটি চেয়ার এর মধ্যেই দখল করে রেখেছে তিনজন মানুষ। সবাই বড় বড়। কেবল মেয়েটি একাই ছোট।

ওকে ঘরে ঢুকতে দেখেই একজন বড় মানুষ বলল, খুকু এসেছিস?

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ বাবা। দেখ কাকে নিয়ে এসেছি?

বলেই মুঠো থেকে মুরগি ছানা বের করে রাখল টেবিলের ওপর। তখনই হই হই করে উঠলেন আরেকজন বড় মানুষ, করিস কি? করিস কি? ভাত-তরকারি নষ্ট করে ফেলবে তো?

খুকু বলল, ফেলবে না। খুব শান্ত।

সত্যিই খাবার টেবিলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল ছানাটি। খুকু মাঝে মাঝেই কয়েকটা করে ভাত দিচ্ছিল ওর সামনে। আর ও খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল। খাওয়া শেষ হতেই সবাই উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে। খুকুও উঠে হাত-মুখ ধুয়ে তারপর ছানাকে নিয়ে চলে এল নিজের ঘরে। এবার আর চেয়ারে বসল না খুকু। বিছানার উপর বসল। হাতে একটা বই। আগের মত এই বইটার দিকে তাকিয়ে বক বক করল না। কেবল তাকিয়েই থাকল। আগের বইয়ের চেয়ে এই বইটা অনেক সুন্দর। সুন্দর সুন্দর ছবি। ছবি দেখেই কিছুটা ভয় পেল ছানা। যদি ছবিগুলো আবার নড়া চড়া শুরু করে। ভয়ে কয়েকবার কিচ কিচ করল। কিচ কিচ শুনে খুকু ওকে তুলে নিল হাতে। তারপর ওর সঙ্গে গল্প শুরু করল। কিন্তু কিছুই বুঝল না ছানাটি। টেবিলের ওপর একটা কাগজ পেতে তার উপর ছানাকে রাখল। তারপর বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ল খুকু। বাতি নেভানোর পর কেমন ভয় ভয় করতে লাগল ছানাটির। কিচ কিচ করতে লাগল। হঠাৎ দুটো জ্বলজ্বলে চোখ দেখল ও। মনে হল কেউ তাকিয়ে আছে ওর দিকে। এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে। কোন বিড়াল নয় তো? কিচ-কিচ-কিচ-কিচ। একটানা কিচ কিচ করেই চলল ও। ভয়ে ওর ছোট্ট বুক কাঁপতে লাগল।

একটানা কিচ কিচ শুনে বিছানা থেকে উঠে বাতি জ্বালাল খুকি। অন্য ঘর থেকে দুজন বড় মানুষ দৌড়ে এল। একজন বড় মানুষ বলল, মুরগি ছানাকে ঘরে না রেখে খোঁয়াড়ে রেখে এস।

এই বড় মানুষটা হল খুকুর মা।

আরেকটা বড় মানুষ বলল, ছানাটাকে আমার হাতে দে খুকু। আমি রেখে আসি।

ওই বড় মানুষটা হল খুকুর বাবা।

হাতে ধরা ছানাটাকে বাবার হাতে দিল খুকু। তারপর বাবা ওকে নিয়ে রেখে এল খোঁয়াড়ে।

খোঁয়াড়ে ছানাকে ঢুকতে দেখেই খুশি হয়ে গেল মা মুরগি। আদরমাখা ঠোকরে ভরিয়ে দিতে লাগল ছানার সারা গা। ছানাটাও মায়ের গরম পালকের তলায় জায়গা করে নিল পরম আয়েসে। তারপর আরামে ঘুমোতে লাগল।

আহমেদ রিয়াজ লেখক, সাংবাদিক

ছোটগল্প

লুঠ

সুব্রত মণ্ডল

আকাশে কোনও মেঘ নেই। শরতের আকাশ কাশফুলের মত ফরসা। তবু মনে মেঘের আসা-যাওয়া। দেবীপক্ষে মৃদুলের মন কালো মেঘে আচ্ছন্ন। সামনে স্বাতী বসে। একজন সফল মধ্যবয়সী ব্যাঙ্কারের স্ত্রীর যেমন রূপ হওয়া উচিত ঠিক তেমনি। মেরিন ড্রাইভে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের দু'হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাট। ব্যাঙ্ক-ই ভাড়া দেয়। সারা পৃথিবী জুড়ে ব্যাঙ্কের শাখা। হংকংয়ে রেজিস্ট্রিকৃত। মুম্বইয়ে ভারতীয় হেড অফিস। অবসরের আর পাঁচ বছর আছে। তারপর? তারপর আর মৃদুল ভাবে না। তাতাই একমাত্র ছেলে। আমেরিকায় থাকে। পড়াশোনা করে। এখনও পর্যন্ত মানব সম্পদ উন্নয়নে ছেলের পেছনে ষাট লাখ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এখন এই যে রাজার মত বিলাসী জীবন ভবিষ্যতের দরজায় নতজানু হবার কথা ভাবছে।

স্বাতী অনেকক্ষণ পরে নিস্তব্ধতা ভাঙে। সিগারেটটা অ্যাস-ট্রেতে কয়েকবার তাচ্ছিল্যভরে ঠোকে, একটা কথা বলার ছিল, তোমার কি সময় হবে? মৃদুল গুপ্ত এই মুহূর্তে ম্যানেজার (অপারেশনস) নয়। কোনও দুর্বিসহ বন্ধনের পেরেকমাত্র। সে স্বাতীর ছোট চুলের দিকে তাকায়। ববকাট তার একদম ভাল লাগে না। সে লম্বা চুলের অনুরাগী। কপালকুণ্ডলার চুলের মত। সে অন্য ম্যানেজারদের স্ত্রীর চুল লক্ষ্য করেছে। স্বামীদের পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চুলের হ্রস্বতা। তাদের জিএম-এর বউয়ের চুল বাচ্চা ছেলেরে মত ন্যাড়া– এমনকি মাথার খুলিও দেখা যায়। সে স্বাতীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

আমার কিছু টাকার দরকার।

কত?

বেশি নয়। পঞ্চাশ হাজার দিলেই চলবে।

এত টাকা? কী দরকার?

স্বাতী বাঁকা ভুরু কুঁচকে বলে, আমায় কি এক্সপ্লানেটরি স্টেটমেন্ট দিতে হবে? তুমি যখন খরচ কর আমায় কি এক্সপ্লানেশন দাও? তুমি মাসে দশ লাখ টাকা পাও। সংসার খরচায় দাও মাত্র এক লাখ। তারপর তুমি খোঁজও রাখো না কী করে সংসার চলে। স্যার, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি বাকি টাকা আপনি কী করেন?

মৃদুল পর পর পদক্ষেপ এবং ঘটনা প্রবাহের সংঘাত চিন্তা করে নেয়। জ্ঞানী ব্যাক্তিরা স্ত্রীর সঙ্গে কদাচ তর্ক করেন না। মৌনব্রত অবলম্বন করেন। সে ক্লাবের উদ্দেশে পা বাড়ায়।

স্বাতীর ধনুকের ছিলার মত ভুরু সরলরেখার রূপ নেয়। বলে, আজ সঙ্গে কে যাবে? মিসেস ভারুচা, না মিসেস দেশাই? আর ওই মেয়েটা তোমাদের অফিসে নতুন জয়েন করেছে– স্বাগতা না কি নাম? কচি কচি দেখতে অথচ তিরিশ পার হয়ে গেছে। ভারী শরীর। জিনস-এর প্যান্ট পরে। আমি হিংসা করছি না, যাই বল প্রচণ্ড সেক্সি।

মৃদুল নীরবে হেমলক পান করে।

কিছুদিন হল, মনে শান্তি নেই। সবসময় ভয়। কী হবে কী হবে!

সে মিসেস ভারুচাকে কথা দিয়েছে একটা নেকলেস উপহার দেবে। দুর্বল মুহূর্তে লিকারের প্রচ্ছন্ন ছায়ায়। বাহুপাশের স্নিগ্ধ আবেশে। এ রকম উপহার মাঝে-মধ্যেই বান্ধবীদের দিতে হয়। এ রকম না হলে বান্ধবীরা ছিটকে যাবে।

সে একটা অন্যায় কাজ করেছে। তার এ কাজের সহযোগী ম্যানেজার (ট্রাস্ট ফান্ড) পলাশ, ম্যানেজার (অ্যাকাউন্টস) উৎপল। এ কাজ তারা বহুদিন করে আসছে। নিরীহ অ্যাকাউন্টিং হেরফের, তাদের ফুর্তির টাকা, বিলাসিতার টাকা এ-সব থেকেই আসে।

ব্যাপারটা অত্যন্ত সরল। পৃথিবীতে বহু কোটিপতি আছেন যারা তাদের অ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট ভাল করে পরীক্ষা করেন না। ব্যাঙ্কের ওপর তাদের পাহাড়প্রমাণ ভরসা। মৃদুলরা কারও টাকা নিয়ে মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি করে। এতে দু'ধরনের লাভ আছে। কেনবার সময় মোটা টাকা কমিশন আবার বেচবার সময় লাভ। আবার মাঝেমাঝে গল্প ওলটপালট হয়ে যায় বাজার যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়। দাম যদি পড়ে যায়। কুছপরোয়া নেই। তখন রামের টাকা শ্যামের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া। আবার শ্যামের টাকা যদুর ঘাড়ে দিয়ে দেওয়া। এ রকম করে চলে আর কি? মোরগা করা হয় সে-রকম অ্যাকাউন্টগুলোকে– মোটাসোটা। লেনদেন খুব কম। এ জিনিস তাদের ব্যাঙ্কে বহুদিন ধরে চলে আসছে। সবাই জানে আবার জানেও না। ম্যানেজার ক্লাবের বিল, লিকারের খরচা, বউয়ের গয়না, বান্ধবীদের দেখ্‌ভাল এখান থেকেই করা হয়।

এটা এমন এক ধরনের পাপ যেটা গঙ্গা জলে ধোওয়া যায়। অর্থাৎ তাদের ক্ষতি অন্য অ্যাকউন্টের পাপ থেকে ঠিক করে দেওয়া।

ড. রজত গুপ্ত প্রায় তিরিশ বছর লন্ডনে আছেন। তিনি বিশ্বের একজন নামকরা পেন্ট বিশেষজ্ঞ। রঙয়ের দুনিয়ায় তাকে সবাই একডাকে চেনে। বিদেশিনী ক্যারোলিনকে বিয়ে করেছেন। তিনি সুখী। খুব সুখী। ছ'মাস লন্ডনে আর ছ'মাস সল্টলেকে নিজের বাড়িতে। দুর্গা পুজোর সময় বাড়ি আসেন। ধুমধাম করে পুজো হয়। আত্মীয়-স্বজন বাড়িতে গমগম করে। ক্যারোলিন তসরের শাড়ি পরে সবাইকে আপ্যায়ন করে। পুজো উপাচার সাজায়, আলপনা দেয়। মুগ্ধ বিস্ময়ে আরতি দেখে।

ড. গুপ্ত স্মৃতি-মেদুরতায় ভোগেন। তার ছেলেবেলার কথা, পাড়ার বন্ধুরা, আত্মীয়-স্বজন। তিনি অর্থের পেছনে ছোটেন না, অর্থই তার পেছনে ছোটে। তার কনসাল্টিং ফার্ম বিশ্বের সব বড় রঙ কোম্পানি থেকে অর্ডার পায়। ড. গুপ্ত তাই প্রায়ই কলকাতায় চলে আসেন। সল্টলেকের বাড়ির বারান্দায় বসে স্মৃতির স্বাদ অনুভব করেন। তার এই দার্শনিক অনুভব আর্থিক ব্যাপারে অনেক ক্ষতি করেছে। লাতিন আমেরিকার কিছু দেশ থেকে তিনি বহু মোটা পাওনা পাননি। কিন্তু তিনি মেনে নিয়েছেন। তিনি জানেন তার দশ টাকা ক্ষতি হলেও একশো টাকা লাভ হবে। কারণ রঙের দুনিয়ায় তার কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। বরং তিনি সময় উপভোগের চেষ্টা করেন। দেশের বাড়িতে মাছ ধরতে যান। ক্যারোলিনকে নিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে যান বাংলাদেশি খাবার খেতে– মোটা টিংড়ি, চিতলের পেটি, দই ইলিশ। ক্যারোলিনের যদি ভাল লাগে, তবে তিনি যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করেন রঙের দুনিয়ায়। এ রকমই তার ভুবন।

আজ একাদশী, মায়ের গতকাল বিসর্জন হয়ে গেছে। তিনি অফিসে বসে স্কচে হালকা চুমুক দিচ্ছেন। তিনি ভাবছেন। আর কতদিন কাজ করতে হবে। টেবিলের ওপর থেকে ব্যাঙ্ক স্টেটমেন্টটা অন্যমনস্কভাবে তুলে নেন। তার মানসিক হিসেব অনুযায়ী ব্যাঙ্কে দু'কোটি টাকা থাকা উচিত। তিনি ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স পরীক্ষা করেন। এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা। প্রায় আশি লক্ষ টাকা কম। তিনি চিন্তা করার চেষ্টা করেন গত কয়েক মাসের মোটা টাকার লেনদেন। সেখানে মোটা টাকার আয়ের কথাই মনে পড়ে, বড় খরচার কথা মনে আসে না। তিনি তাচ্ছিল্যভরে ফাইলটা আবার রেখে দেন। তার অগাধ বিশ্বাস ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ওপর। প্রায় কুড়ি বছর তার ব্যাঙ্কার। তাছাড়া সব কাজ কম্পিউটারে হয়, কী করে ভুল হবে? তার নিজেরই হয়তো কিছু ভুল হবে। তিনি ঠিক করেন আগামীকাল ঠাণ্ডা মাথায় কাগজপত্র পরীক্ষা করে সিদ্ধান্তে আসবেন।

মৃদুল ক্লাবে বসে। সঙ্গে পলাশ ও উৎপল। ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান মুম্বই অফিসে ফ্যাক্স করেছেন ড. গুপ্তর সব কাগজপত্র হংকং-এ পাঠিয়ে দিতে। ড. গুপ্ত চেয়ারম্যানকে অভিযোগ করেছেন তার অ্যাকাউন্টে আশি লক্ষ টাকা খরচা লেখা হয়েছে, তার অজান্তে এবং তার হিসেবের বাইরে।

পলাশ হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে বলে, দ্যাখ আমরা প্রথম থেকে একসঙ্গে আছি। শেষেও থাকব।

মৃদুল বলে, আমাকে পাবি না, আমি প্রথম থেকেই বারণ করেছিলাম, এত লোভ ভাল নয়।

উৎপল টেবিলে সজোরে ঘুষি মারে। সতী এখন সতীত্ব ফলাচ্ছ। মালটা নেবার সময় তোমার বিবেকের বাণী কোথায় ছিল?

পলাশ বলে, আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে। ছেলে-বউয়ের কাছে মুখ দেখাব কি করে। এত বড় ফ্ল্যাট। দুটো গাড়ি। অনুরাধা গাড়ি ছাড়া একপাও নড়তে পারে না। আবার একটা নতুন গাড়ি বুক করেছে। পয়সার অভাবে ও যদি রেসের মাঠে না যেতে পারে তো নার্ভাস ব্রেকডাউন হবে।

উৎপল বলে, আমি ছেলেকে কথা দিয়েছি বিজনেস ম্যানেজমেন্ট করতে লন্ডনে পাঠাব।

মৃদুল বলে, অফিসের স্বাগতাকে কথা দিয়েছি সিঙ্গাপুর ট্রিপ করাব। সব গুবলেট হয়ে যাবে। সে চিন্তিত গলায় বলে, আমি এখন এসব কথা ভাবছি না। আমার চিন্তা অন্য।

উৎপল ও পলাশ একসঙ্গে বলে ওঠে, কী অন্য?

আমি ভাবছি ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের কথা। চিটিং ও ফরজারি। জেল হাজতের কথা।

পলাশ বলে মিউচুয়াল ফান্ডের অ্যাপলিকেশন ফর্মে ড. গুপ্তর জাল সই করেছিল মৃদুল। সুতরাং ওর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি।

মৃদুল বলে, না আমি সই করিনি। আমি এত বোকা নই। অন্য কাউকে দিয়ে সই করিয়েছিলাম। আমি যদি ডুবি, তোদেরও সঙ্গে নিয়ে ডুবব।

মৃদুল রাত্তিরে স্বাগতার ফোন পেল। হাস্কি গলা। মৃদুলদা আমরা কবে যাচ্ছি?

কোথায়?

এ মা ভুলে গেলেন সিঙ্গাপুর, লন্ডন, প্যারিস। আপনি আমায় কথা দিয়েছেন।

মৃদুলের গা রি রি করে ওঠে। বলে, আমি, এখন খুব ব্যস্ত। তোমায় পরে ফোন করব। ফোনটা কেটে দেয় । আবার স্বাগতার ফোন আসে। সে সুইচ অফ করে দেয়।

পলাশ রাত্তিরে বিছানায় এপাশ ওপাশ করে। ঘুম আসে না। বউ অনুরাধা ঘুমাচ্ছে। মৃদু নাসিকা গর্জন শোনা যাচ্ছে। পলাশ বাথরুমে যায়। ফিরে এসে বারান্দায় বসে। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে মুম্বই শহরের দিকে।

কী হবে? আত্মহত্যা ছাড়া আর কী পথ। বারোতলার ফ্ল্যাটের রেলিং শক্ত করে চেপে ধরে। তলাটা ঝুঁকে দেখে। গা-হাত-পা শির শির করে। কাঁধে ঠাণ্ডা চাপ লাগে। কখন অনুরাধা উঠে এসেছে।

কী ঘুম আসছে না?

না ঘুম আসছে না।

চল শোবে চল, আমি গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।

অনুরাধা পলাশের গায়ে হাত বুলিয়ে দেয়। আদুরে গলায় বলে, এই কাল আমায় দশ হাজার টাকা দেবে তো?

কেন?

ওমা মাঠে যাব মনে নেই! দু'পাঁচশো টাকা লাগিয়ে কোনও প্রেস্টিজ থাকে না। তোমার অফিসের বাচ্চা মেয়েগুলোও দু'পাঁচ হাজার টাকা

খেলে। আমি এত বড় অফিসারের বউ।

পলাশ সজোরে বুক থেকে হাতটা সরিয়ে দেয়। অনুরাধা বলে, কী হল? টাকার কথা বলতেই রাগ হয়ে গেল? আমি তো জিতলে তোমার টাকা ফেরত দিয়ে দিই। মিসেস কাপুর তো কোনওদিন দেয় না। আমি কত লক্ষ্মী বউ বল তো?

পলাশ চিন্তা করে আজ পর্যন্ত কত টাকা অনুরাধাকে ঘোড়ার পেছনে দিয়েছে। মুখ গম্ভীর করে বলে, বল তো একটা সহজ প্রশ্ন। তোমার জানা উত্তর।

কী প্রশ্ন?

মানুষের অপরাধের পেছনে কী কারণ থাকে?

এই ধর, লোভ প্রতিহিংসা।

আর একটা উত্তর তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে গেলে। আর থাকে নারী। আমি যদি কোনওদিন ফেঁসে যাই তো তোমাকে দায়ী করে যাব।

অনুরাধা বিছানায় উঠে বসে। এসব কী বলছ তুমি। সামান্য দশ হাজার চাইলাম তাতেই এত কান্নাকাটি। ঠিক আছে বাবা তুমি পাঁচই দিয়ো।

পলাশ অস্বাভাবিক রকমের অর্থপিপাসু। সে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুললে নতুন নোট নেয়। তারপর চেম্বারে বসে নতুন বান্ডিলের গন্ধ শোঁকে। এই যৌনগন্ধী নতুন বান্ডিল তাকে আবিষ্ট করে। সে বেশ কিছু সময় টেবিলে টাকার বান্ডিলের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। তার অর্থের প্রয়োজন ভীষণভাবে। অনুরাধার গাড়ি। শাড়ি পালটানোর মত গাড়ি পালটানো। প্রায়ই রেসের মাঠ। বিদেশী প্রসাধনী। সাঁড়াশির মত তার ওপর চাপ। প্রত্যেক মাসে ক্রেডিট কার্ডে মোটা টাকা খরচ করে। আপত্তি করলে অত্যন্ত উগ্রভাবে ঝগড়া করে। সে যেন মাকড়সার জালে বন্দী শিকার। এই সিজোফ্রেনিক স্ত্রীকে নিয়ে তার আতঙ্ক আছে। সে এখন মেনে নিয়েছে তার ভবিতব্য। সামনে প্রদীপের আলো, সে পতঙ্গ প্রজাতি।

মৃদুল স্বাতীকে ঘৃণা করে। স্বাতীর ছোট চুল, বেহিসাবী খরচ, ছুরির ফলার মত কথাবার্তা। সে ভয় করে। তার হৃদয় থেকে স্বাতী হারিয়ে গেছে। ফলত সে সাবমিসিভ চরিত্রে অভিনয় করে। স্ত্রীর প্রতি তার যৌন আকর্ষণ হারিয়ে গেছে। সে অন্য নারীতে আশ্রয় নেয়। মিসেস ভারুচা, মিসেস দেশাই, নবতম সংযোজন অফিসের স্বাগতা। তার বহু টাকা চলে যায়। স্বাগতার মোটাসোটা চেহারা। সে তীব্র আকর্ষণ বোধ করে। তার থেকে প্রায় বিশ বছরের ছোট। ভারী নিতম্ব। সুডৌল স্তন। মৃদুল অন্ধকারে বসে মনরতির চর্চা করে। কিন্তু স্বাগতার চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। এখন ওয়ার্ল্ড ট্যুর চাইছে। সিঙ্গাপুর, লন্ডন, প্যারিস। কয়েক লক্ষ টাকার ধাক্কা। সে অন্ধকারে কোমল বাহুডোরের মায়ায় কথা দিয়েছে। সে লোভের সোমরসে সিক্ত হয়ে চৌর্যবৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছে। বুক হিম হয়ে আসে। অন্তত সাত বছর জেল। ছেলে, বউ, বন্ধু-বান্ধব। তার বান্ধবীরা। সে আর চিন্তা করতে পারে না। বালিশে মুখ গুঁজে ঘুমের চেষ্টা করে।

উৎপল নিজের এসি চেম্বারে দরদর করে ঘামে। শ্বেতা গতকালই মনে করে দিয়েছে ছেলেকে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা অ্যাডমিশন ফি পাঠাতে হবে লন্ডনে। বাবু সাদামাটা ছেলে। এখানে কোনও ভাল কলেজে এমবিএ-তে চান্স পায়নি। উৎপল অন্য কোনও কোর্সের কথা ভাবছিল। কস্টিং, বিবিএ কিন্তু শ্বেতা ছেলের মতই নাছোড়বান্দা, ছেলেকে এমবিএ পড়াবেই। হাউসিংয়ের বেশির ভাগ ছেলে, যারা বাবুর বয়সী, সব ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডাক্তারি পড়ে। সুতরাং বাবুকে এমবিএ পড়তেই হবে যে কোনও মূল্যে। শালা নির্মাল্য অনেক খোঁজখবর রাখে, বলল, ইউকে-তে অনেক ইউনিভার্সিটি আছে যারা টাকা খরচ করলে নিয়ে নেয় আমাদের সাউথ ইন্ডিয়ান কলেজগুলোর মত। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাবুকে ভর্তি করতে হল। আরও তিন বছর টানতে হবে। এখনও পঞ্চাশ লাখ খরচ হবে। মাথা ঝিমঝিম করে। সে তার শিক্ষাদীক্ষা, অতীতের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ, সততা সত্ত্বেও জালিয়াতিতে জড়িয়ে পড়েছে। তার মূল্যবোধকে দুরমুশ করছে শ্বেতা আর বাবু। গিলোটিনে মাথা দিয়ে সে ধ্যানস্থ হয়েছে। সে এখন সবাইকে ঘৃণা করে। এমনকি নিজেকেও।

ড. গুপ্ত আমার অনেক দিনের মক্কেল। তার আয়কর আমিই দেখাশোনা করি। ঘনিষ্টতা বেড়েছে। অনেকটা আত্মীয়ের মত। উনি আমার পছন্দের মানুষ। তার স্বভাব-মাধুর্য সরলতা পাণ্ডিত্য সততা আমায় আকর্ষণ করে। তার জীবনবোধের একটা দিক আমার খুব অবাক লাগে। এই লাভের দুনিয়ায় তার নির্লোভ মনোভাব। তিনি আমাকে পুরো ঘটনা বললেন। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনের ওপর আমার পুরনো রাগ ছিল। আমার একটা পুরনো লোন-এর ব্যাপারে খুব জ্বালিয়েছিল। সম্মানে প্রায় ঝামা ঘষার মত।

আমি বললাম, আপনি কী চান, টাকা না প্রতিহিংসা।

উনি নির্লিপ্ত গলায় বললেন, আমি বিচার চাই। টাকা আমার প্রচুর আছে। আমি দোষী মানুষদের মুখোশ খুলে দিতে চাই।

আমি বললাম, আপনি ব্যাঙ্কিং ওমবুড্সম্যান আর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

করেছি, ইট ইজ অ্যা লং প্রোসেস। আমার ধৈর্য নেই। আমার ব্যবসার সময় নষ্ট। আমার যে টাকা গেছে আমি ছ'মাসে কামিয়ে নেব। আপনাকে আমি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি দিয়ে দিচ্ছি, আপনিই সব কিছু করুন।

আমি দার্শনিক নই। একজন সাধারণ আয়কর আইনজীবী। আমার রক্তে প্রতিহিংসা আছে। ক্রোধ আছে। একদল বাস্টার্ড একজন সৎ মানুষের টাকা নয়ছয় করবে। আমি মানতে পারছি না।

ডিসিডিডি বন্দনা সেনের চেম্বারে মিষ্টি গন্ধ স্প্রে করা আছে। ওই ছোটখাটো মহিলাটি কলকাতার ক্রাইম দেখেন বিশ্বাস হয় না। দু'এক মিনিট কথা বলতেই ভুল ভেঙে গেল। স্পষ্ট অল্প কথা। কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা আমাকে আশ্বস্ত করল। উনি সমস্ত কাগজপত্রের অনুলিপি দিতে বললেন।

পুলিশকে সবাই ভয় করে। বিশেষ করে গারদখানাকে। সমস্ত মেকি আভিজাত্য মুচমুচে কচুরির মত ভেঙে পড়ে। সকালবেলা মুম্বই থেকে উড়ে এল আধা ডজন ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। ড. গুপ্ত তখন সবে কালো কফিতে চুমুক দিয়েছেন, ক্যারোলিনকে দুর্গামূর্তি ব্যাখ্যা করছেন। একটা সুন্দর পবিত্র সকাল।

মৃদুল প্রায় পায়ে পড়ার ভঙ্গীতে বলে, স্যার আমাদের বাঁচান। আমার বউ-ছেলে আছে। আত্মহত্যা করতে হবে।

ড. গুপ্ত বললেন, আপনাকে দেখলে তো মনে হয় না, পঞ্চাশ পেরিয়েছে। এর মধ্যেই আপনি কত কারুকাজ শিখে ফেললেন। বহু টাকা তো মাইনে পান, তাতেও আপনার চলে না, কারণ কী?

পাশ থেকে উৎপল বলে, ভুল হয়ে গেছে স্যার। আর কোনওদিন হবে না।

ভুল হয়ে গেছে? আপনি চুরি করে বলছেন ভুল হয়ে গেছে। তাহলে চুরির শাস্তিও তো পেতে হবে। আইন যা করার করবে।

পলাশের বয়স প্রায় পঞ্চাশ। কিন্তু দেখলে মনে হয় না চল্লিশ পেরিয়েছে। সুদর্শন চেহারা। সে কেঁদে ফেলে, আমরা স্যার আপনার সন্তানতুল্য। একটা সমঝোতা করে নিন। ফিফটি ফিফটি। আমরা চল্লিশ লাখ ফেরত দিচ্ছি আর আপনার চল্লিশ। আমাদের ধনেপ্রাণে মারবেন না স্যার।

ড. গুপ্ত কিছুক্ষণ ভাবেন। নিজের পুত্র থাকলে প্রায় উৎপলের বয়সই হত। এই তিনটে ছেলের যদি জেল হয়। সংসারে কী হবে? সবচেয়ে জরুরি তার কত সময় লাগবে আইনের গোলকধাঁধায়। তাতে তার আর্থিক ক্ষতি কী হবে?

তিনি মৃদু হাসেন। ওদের আশ্বস্ত করেন।

আমি যখন শুনলাম উনি ব্যাঙ্কের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়েছেন, রাগে আমার গা রি রি করতে লাগল। চুপচাপ চেয়ারে বসে রইলাম। আমার কাছে চল্লিশ লাখ টাকা অনেক টাকা। টাকার অভাবে নিজের বাড়িও করতে পারিনি, আর কটা বাচ্চা ছেলে চল্লিশ লাখ টাকা গায়েব করে দিল। ধীরে ধীরে মাথা ঠাণ্ডা হয়। অবচেতন মনে ভাবি, আমি কেন ড. গুপ্তর টাকার ব্যাপারে এত মাথা ঘামাচ্ছি? ওঁর টাকার ওপর আকর্ষণ? লোভ? প্রতিহিংসা? আমার সঙ্গে কী তফাত এই ম্যানেজারগুলোর? তাহলে কি লুঠের টাকার বখরা সবাই চায়?

আমি ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিই।

সুব্রত মণ্ডল ভারতের কবি, কথাকার

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

পাসিং শো

অমর মিত্র

দশ.

অনি বলল, বাবা, সেই লোকটা কিন্তু উধাও হয়ে গেছে।

বিমল বিশ্বাস?

ইয়েস বাবা।

অতীন বলল, হ্যাঁ, বাজারেই আসছে না, অসুখ-বিসুখ হল কি না কে জানে?

না না, তোমার সেই লোক নয় বাবা, আমার বিমল বিশ্বাস ফ্রম ডুমুরে, বেতনা নদীর তীরের মানুষ, বাংলাদেশ, তাকে আর খুঁজেই পাচ্ছি না, উধাও ফ্রম ফেস বুক।

অতীন জিজ্ঞেস করে, তার মানে?

নেই, সার্চ করে দেখলাম, নাহ, অন্য বিমল বিশ্বাস আছে, নাগপুর, কানপুর, বহরমপুর, কলকাতা, ইউনিভার্সিটি অফ কলকাতা, বর্ধমান, টেক্সাস, টরেন্টো, নিউ জার্সি কিন্তু নো বিমল বিশ্বাস ফ্রম ডুমুরিয়া, বাংলাদেশ।

নেই কেন? জিজ্ঞেস করে অতীন। দরজা-জানালা খড়মড় করে নড়ছে। ঝড় এসে গেছে। শোঁ শোঁ শোঁ শোঁ ভীষণ আক্রোশে বাতাস আছড়ে পড়ছে শহরের উপর। লণ্ডভণ্ড করে দেবে সব। অতীনের আবার মনে হল, কে যেন জানালা কিংবা দরজার ওপারে এসে দরজা বা জানালায় ধাক্কা দিচ্ছে। তখন অনি বলল, এমন হতে পারে লোকটা ওই কথা বলে নিজের অ্যাকাউন্ট ডি-অ্যাক্টিভ করে দিয়েছে।

ওই কথাটা বলার জন্যই সে ফেসবুকে এসেছিল, অদ্ভুত লাগছে আমার। ডি-অ্যাক্টিভ করলে কী হয়? জিজ্ঞেস করল অতীন।

ওঁকে আর দেখা যাবে না। বলল অনি।

অতীন বলল, তোকে ব্লক করে দিতে পারে তো।

তা পারে, কিন্তু কেন ব্লক করবে বল দেখি, আমি তো তাঁকে ডিস্টার্ব করিনি।

দরজায় ধাক্কা পড়ছিল। অতীন বলল, দরজাটা খুলে দে তো অনি, কেউ এল?

শম্পা বলল, পশ্চিমা বাতাস ঠেলছে।

এগিয়ে যায় অতীন, উঁহু, কেউ ডাকছে যেন।

অনি বলল, কেউ এলে তো কলিং বেল বাজাবে।

অতীন স্পষ্ট শুনতে পেল, বাতাসে তার নামটা হারিয়ে যাচ্ছে। মিতে...অতীনভাই... বহুদূর নদীর ওপার থেকে ডাকছে কে যেন? সে প্রায় ছুটে গিয়ে দরজাটি খুলল। আর খুলতেই হুড়মুড়িয়ে ঝড়ের বাতাসের সঙ্গে বিমল বিশ্বাস। বৃষ্টিতে ভিজে গেছে সে। তাকে টেনে ভিতরে ঢুকিয়ে নিল অতীন, তুমি এই ঝড়ে?

বিমল ভিতরে ঢোকার পর যেন দম নিচ্ছে। তার পরনে সেই চেক কাটা পুরনো লুঙ্গি আর হাফ শার্ট। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা। গালে দিন কয়েকের না কামানো দাড়ি। সে ভিতরে ঢুকে ধাতস্থ হতে পারছিল না। অনি তাকে অবাক হয়ে দেখছে। শম্পা একটা তোয়ালে এনে দিল মাথা মোছার জন্য। বিমল বলল, বিস্টি আসতে আসতেই আমি ঢুকে পড়েছি এ বাড়িতে, বাজ পড়ার ভয় খুব আমার অতীন, বজ্রপাত, আমার কুষ্টিতে লেখা আছে, প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যু।

অতীন বলল, আমি ওসব বিশ্বাস করি না, ভিতরে এস।

বিমল বলল, বাবার গুরুদেব বলে গিয়েছিল, ঝড় বাদলা, মেঘ, নদীর বান, এইসব থেকে সাবধান থাকতে, কিন্তু উল্টো কথা এই যে, আকাশে মেঘ ওঠা দেখতি আমার ভাল লাগে, ঝড়-বাদলায় মন মজে।

বিমল ভিতরে এসে বসেছে সোফায় আড়ষ্ট হয়ে। অতীন তার সমুখে। শম্পা একধারে চেয়ারে আর দরজার কাছে অনি। তার বিস্ময় যাচ্ছে না। সে বিমল বিশ্বাসকে এই প্রথম দেখছে। অতীন বলল, চা খাবে তো?

ঘাড় কাত করে বিমল। তারপর বলে, একটু বাদে, এত মেঘ অনেকদিন দেখিনি অতীনভাই, উফ্‌ফফ্, আকাশের একটুখানিও খালি ছিল না, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কালো মেঘে সেজে উঠল, সব চোখের সুমুখে দেখলাম, কী ভয়ানক দেখনদারি তার ভিতরে।

তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে?

মাঠে গিয়ে বসে ছিলাম, তুমি তো যাওনি কোনদিন দুকুরে, বেলা একটা দেড়টার পরে ওই নির্মল ডাক্তারের বাড়ির দিকের মাঠের ধারের শিরিস গাছের একটা ছায়া নেমে আসে ঘাসের উপর, এই গরমকালটায় তা হয়, সূর্য তো উত্তরে ঢলে, তাই, গরমকালটায় আমি সেই ছায়ায় বসে থাকি, কী যে সুখ হয় আমার, ঘুম এসে যায়, তখন যে স্বপ্ন আসে তা ছোটবেলার, আজ ঘুম আসার আগে কিংবা ঘুমের ভিতর আমি নিজি দেখলাম যেন পাতাল থেকি মেঘ উঠতি, আমার খেয়াল নেই যে ঝড় উঠছে, অন্ধকার হয়ে আসতি লাগল, কালো মেঘের নিচ দিয়ে শাদা বকের সার উড়ি যেতি দেখলাম, অনেকদিন আগের কথা মনে পড়ল।

অতীন বলল, কালো মেঘের নিচে বকের সার, হ্যাঁ, মনে পড়ল আমারও।

তুমার মনে পড়ে কী করে মিতে? বিমল জিজ্ঞেস করে।

ছেলেবেলার কথা আবার ভেসে এল। চাপা গলায় বলল অতীন, যেন কথাটা আর কেউ শুনতে না পায়।

সেই যে কোন যুগের ওপারে তার বাল্যকালে দেখেছিল মেঘের নিচ দিয়ে বকের সারি, ধবল বকের উড়াল। আজই তাকে ফিরে আসতে হল সেই বাল্যকালে! বিমল বলল, তুমি কি আগের দিনির কথা মনে করতি পার?

অতীন বলল, পারি।

স্বপ্নে আগের দিন আসে?

আসে, খুব আসে।

ঘনঘন আসে মিতে? বিমল জিজ্ঞেস করে।

না, আচমকা, স্বপ্নের কোন মানে নেই। অতীন বলে।

বলতি পারি নে মানে আছে কী নেই। বলল বিমল, মানে যদি না থাকে তবে স্বপ্ন হয় কেন, আমি কদিন আগে ডুমুরের স্বপ্ন দেখিছি, একদিন না, পর পর, আমি ঘুমোবার আগে ডুমুরে যাবার জন্যি রেডি হয়ে যাচ্ছিলাম, শুনতেছ মিতে। বিমল বিশ্বাস তার দিকে ঝুঁকে পড়ল, বুঝতি পারতাম আমি ডুমুরে যাচ্ছি, আমাদের যে গাঙ ছেল বেতনা, তা পার হয়ে আমি ডুমুরে, আমার ঠাকুদ্দা যাদবচন্দর, তাঁর বাপ কুবেরচন্দর, তাঁর বাবা লক্ষণচন্দর দাঁড়ায়ে ঘাটে, কী বুঝলে?

তুমি তোমার এতজন পূর্বপুরুষকে চেন, দেখেছ? অবাক অতীন জিজ্ঞেস করে।

আমি কী করে চেনব, আমারে চিনায়ে দিল। বিমল বিশ্বাস বলল।

কে চেনাল? অতীন জিজ্ঞেস করে।

মনে হয় আমার বাবা। জলে ধোয়া মুখে নির্লিপ্ত স্বরে বলল বিমল বিশ্বাস।

তোমার বাবা এতজনকে চিনত, মানে দেখেছিল? অতীন জিজ্ঞেস করে।

তার বাবা চিনায় দিল। বলল বিমল বিশ্বাস।

তুমি কি ডুমুরিয়া দেখেছ আগে?

খুব অল্প বয়সে আমার দেখা, অল্প অল্প মনে আছে, বাকিটা স্বপ্নের ভিতরে এসে গেছে, আমরা

অমর মিত্র

অমর মিত্রের জন্ম ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আগস্ট অধুনা বাংলাদেশের সাতক্ষীরার নিকটবর্তী ধূলিহর গ্রামে। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও পারিবারিক আবহে সাহিত্য তাঁর বিচরণক্ষেত্র হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে *ধ্রুবপুত্র* উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার লাভ করেন অমর। এর আগে, *অশ্বচরিত* উপন্যাসের জন্য ২০০১ সালে পান বঙ্কিম পুরস্কার। অন্যান্য পুরস্কারের মধ্যে রয়েছে, শরৎ পুরস্কার (ভাগলপুর, ২০০৪), সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার (১৯৯৮), গজেন্দ্রকুমার মিত্র পুরস্কার (২০১০)। বর্তমানে কলকাতা শহরে বসবাসরত অমর মিত্রের সাহিত্যিক জীবনের সূচনা ১৯৭৪ সালে। প্রথম উপন্যাস *নদীর মানুষ* ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় *অমৃত* পত্রিকায়।

হারিয়ে একটি গান *পাসিং শো*-র কেন্দ্রবিন্দু। এই উপন্যাস একটি হারিয়ে যাওয়া গান আর হারিয়ে যাওয়া রেকর্ড নিয়ে। মানুষ তার জীবনে যা হারায় তাই বুঝি ফিরিয়ে আনতে চায় এইভাবে। একটি গান রেকর্ড করে যে গায়ক মুছে গেছেন স্মৃতি থেকে, সেই গান বুঝি ফিরে আসে গভীর রাতে, বাতাসে ভেসে কিংবা স্বপ্নের ভিতরে। আশ্চর্য এই কাহিনি যেন হারিয়ে যাওয়া জীবনেরই অন্বেষণ। আর এক অজ্ঞাতপ্রায় শিল্পীর প্রতিরোধে এই উপন্যাস পেয়েছে অনন্য এক মাত্রা। *পাসিং শো* যেন প্রবহমান জীবনের অফুরন্ত এক প্রদর্শন। *পাসিং শো* কলকাতার বিখ্যাত নাটকের দল *সায়ক* নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করছে নিয়মিত।

সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত অমরের *ধ্রুবপুত্র* খরাপীড়িত প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের কাহিনি– কবি কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের এক বিপরীত নির্মাণ যেন। দীর্ঘ এই আখ্যান শেষ পর্যন্ত শূদ্র জাতির উত্থান ও কবির প্রত্যাবর্তনে পৌঁছয়। অন্যদিকে বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত *অশ্বচরিত* তথাগত বুদ্ধের ঘোড়া কন্থক ও তাঁর সারথী ছন্দকের কাহিনি। ভারতীয় প্রতিবেশে জাদু বাস্তবতার ব্যবহার রয়েছে এ উপন্যাসে। অনন্য ক্লাসিকধর্মী এই উপন্যাস দু'টি বাংলা উপন্যাস ধারায় এক আলাদা রীতির জন্ম দিয়েছে।

কেন সেই অতুলকাকা, ওরা আমাদ্দের নমঃর ভিতরে শিক্ষিত, উনি অতুল রায়, ওঁর বাপ পতুল রায়, তাঁর বাপ নিতুন রায়, ওঁরা গানপাগলা লোক ছিল, ডুমুরেতে ওঁদের নামে কেত্তনের দল ছেল, সেদিন যে তুমি বললে সেই গানের কথা, নদীটি গিয়েসে চলিয়া, পথ পড়ি আসে ধূলায়...

ওপার থেকে এসে উঠলাম মসলন্দপুরির দিকি রিফুজি ক্যাম্পে, সেখেন থেকে কী করে কলকাতা চলি আলাম জানা নেই, আমার দুটো বুন ক্যাম্পে ভেদবমিতে মরি গিইলো, তাই জন্যি হতি পারে।

অনি ধীর পায়ে ঘরে ঢুকে মেঝেতে বসে পড়েছে নিঃশব্দে। অবাক হয়ে বিমল বিশ্বাসের কথা শুনছে। তার চোখেমুখে যে বিস্ময় তা অতীন দ্যাখেনি অনেকদিন। এখন তো বিস্ময় ভুলেছে মানুষ।

কম বয়সীদের কাছে সমস্ত বন্ধ দরজা খুলে গেছে। সমস্ত বিশ্ব পরিভ্রমণ করে তারা সমস্ত রাত ধরে।

কলকাতায় বসে টরেন্টোর লোকের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে। তার ফলে বাস্তবতা থেকে মানুষ ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। স্যোসাল নেটওয়ার্কিং সাইটই বাস্তব হয়ে উঠছে তাদের কাছে। ফলে ঘরমুখী হয়েছে মানুষ বেশি। অনি দেখছে তার কম্পিউটারের মনিটর থেকেই যেন লোকটা বেরিয়ে এসেছে। ফেসবুকের বিমল বিশ্বাসের প্রোফাইল পিকচার ছিল একটি খেজুর গাছে ওঠা শিউলির। সে গাছে উঠে রসের ভাঁড় নামাচ্ছে। এই লোকটা হতে পারে কি? এ তো বাজারের তরকারি বেচিয়ে বিমল বিশ্বাস, তার বাবার সঙ্গে ক্লাস সিক্স অবধি পড়েছিল। হতদরিদ্র। অনি নানা রকম ভাবছে আর অবাক করা কথা শুনছে বিমল বিশ্বাসের কাছ থেকে। বিমল বলছে, সে জানতে পারে স্বপ্নের কথা আগাম, সেই মত তৈরি হয়ে ঘুমোতে যায়, ঘুমের ভিতরেই সে শান্তিতে থাকে বাপ ঠাকুদ্দার সঙ্গে।

অতীন জিজ্ঞেস করল, তুমি ফেসবুক বোঝ?

বই, সেডা কী বই মিতে?

কম্পিউটার?

শুনেচি, দেখেওচি।

অতীন বলল, ফেসবুক কম্পিউটারে হয়।

বিমল হাসে, হতি পারে, জগতে কত কিছু হয়, আমি জানি নে, ভগবান ও থেকে বঞ্চিত করে রেখেচেন আমারে।

অতীন বলে, যাদের তুমি চেন না, দ্যাখোনি জীবনে, তাদের দেখতে পাবে ওখানে।

বিমল ঘাড় নাড়ে বোদ্ধার মত, বলে, বইয়ে তো তাই থাকে, আমার মনে আছে আমাদের একটা বই ছেল, তাতে কার কথা ছিল যেন, একেবারে বরফের দেশে গিয়ে হাজির, বরফের ঘর, কী বলে তাদের যেন।

এস্কিমো, ইগলু। বলে ওঠে অনি। চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে অনিকে দ্যাখে বিমল বিশ্বাস। তাকিয়েই থাকে। অনিও তাই। বিমল তার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠে বলে, তুমার ছেলে?

হ্যাঁ, ও অনি, অনীশ।

তুমারে আমি দেখিচি। বিমল অনির দিকে তাকিয়ে বলে।

কোথায় দেখলেন? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

তা মনে নেই, কিন্তু দেখিছি। বলল বিমল।

অতীন বলল, দেখতেই পার বিমল, বাজারে দেখেছ হয় তো, রাস্তায়।

নাড়ে বিমল, না তা না, রাস্তাঘাটে দেখা না।

তবে কোথায়?

মনে করতি পারছিনে, তোমার কি কিছু মনে পড়ে? বিমল জিজ্ঞেস করে অনিকে।

অনি যে কী বলবে তা অতীন জানে, কিন্তু অনি মাথা নাড়ে। বাইরে বৃষ্টির দাপট কমে আসছে মনে হয়। বাতাসের উন্মাদনাও কমের দিকে। বিমল বিড়বিড় করে, অনুচ্চ গলায় বলে, যেন একদিন কথা হল, গলার স্বর চিনা মনে হল, অবিশ্যি না হতিও পারে, আমার মনে হওয়াটা যে সত্যি হবে তা কেডা বলেছে?

অনি আস্তে আস্তে উঠে যায়। তার দিকে তাকিয়েই থাকে বিমল বিশ্বাস। নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কম্পিউটারে বসল মনে হয়, অনি সার্চ করবে আবার, তা বুঝতে পারে অতীন। বিমল কেমন হতভম্বের মত বসে আছে। তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে সে বিড়ম্বনায় পড়েছে সত্যি। মাথার ভিতরে খুঁজে যাচ্ছে অনিকে সে কোথায় দেখেছে। অনির গলার স্বর শুনে চমকে উঠল কেন? শম্পা বলল, বাদ দিন, বলুন আপনার স্বপ্নের কথা।

স্বপ্ন! বিভোর হয়ে গেল বিমল বিশ্বাস, তারপর বলল, আমি কি ওর সঙ্গে স্বপ্নের ভিতর কথা বলেছি, হতি পারে মিতে, আর তা হলি উনি জানবে কী করে?

বাইরে এখন আবার বৃষ্টি ঝেঁপে নামল। শম্পা বলল, অনিকে আপনি স্বপ্নে দেখেছেন?

বিমল বলল, তাই হবে হয়তো, সেখেনেই কথা বলেছি মনে হয়।

তখন অতীন সিধে হয়ে বসল, বলল, সত্যি বলছ?

হ্যাঁ মিতে আমার মনে পড়ছে, আমি সেদিন ভেবেছিলাম যে আসবে স্বপ্নে, তারে আমি চিনিনে, ঠিক তাই, অবিকল তাই।

কোথায় দেখা হল? অতীন জিজ্ঞেস করল।

সে জায়গাটা আমি চিনিনে, বলতি পারব না।

কী কথা হল?

আরে তিনি তো আমাদ্দের ডুমুরের লোক, সেই লোকটা। বলল বিমল বিশ্বাস।

কার কথা বলছ? জিজ্ঞেস করে অতীন।

কেন সেই অতুলকাকা, ওরা আমাদ্দের নমঃর ভিতরে শিক্ষিত, উনি অতুল রায়, ওঁর বাপ পতুল রায়, তাঁর বাপ নিতুন রায়, ওঁরা গানপাগলা লোক ছিল, ডুমুরেতে ওঁদের নামে কেত্তনের দল ছেল, সেদিন যে তুমি বললে সেই গানের কথা, নদীটি গিয়েসে চলিয়া, পথ পড়ি আসে ধূলায়, আমি তো উ গান শুনিসি, এখনো শুনি, উ গান শুনলি চোখে জল এসি যায়, আমার বাবাও কানত। বলে চোখ মোছে বিমল বিশ্বাস। আমি সেই দিন মনে করতি পেরিসি, উনি বড় চাকরি করত, সব মনে পড়ি গেল।

রেকর্ড, রেকর্ডটা আছে?

না, উনার মুখি শুনিছি, কলকাতার কুথায় যেন থাকত।

কোথায়? জিজ্ঞেস করে অতীন।

সে কি আমি জানি, বাবার সাথে গিইসিলাম, হাবা সিলাম তো।

তারপর?

তারপর আর কী, এইডা তুমার জানা উচিত, তাই বললাম।

শম্পা আর চুপ করে থাকতে পারে না, বলল, কিন্তু অনির সঙ্গে দেখা

বিমল বিশ্বাস কি সত্যি এসেছিল, না কি বিমল বিশ্বাস আসুক তারা মনে মনে ভাবছিল তাই। অতীন উঠে পাশের ঘরে মানে অনির ঘরে যায়। দ্যাখে অনি ঘুমিয়ে পড়েছে। যাহ্! এই অবেলায় কি কেউ ঘুমোয়? কম্পিউটারে বসে নানা সাইটে প্রবেশ করার কথা তো এই সময়।

হল কী করে?

বিমল বিশ্বাস ওঠে। বাইরে বৃষ্টি থেমেছে, বলল, আমি ইবার যাই।

কিন্তু বলে গেলেন না?

গান আর অতুলকাকারে মনে করতি স্বপ্নের ভিতরে একজন এসে গেল, আমি ভেবিছিলাম অতুলকাকা হবেন, কিন্তু না, তুমার ছেলেডা, জিজ্ঞেস করে, গানটার খোঁজ পাবে কী করে, আমি বলিছিলাম ধর্মতলায় গুলাম হুসেনের কথা, আমি তখন চাঁদনিতে ভাঙা রেডিও, টেপ বেচতাম, ফিরার সময় যেখেন থেকে টেরামে চাপতাম সেখেনে গুলাম হুসেনের দুকান পুরনো রেকডের, গান বাজাত, আমি একদিন শুনেছিলাম গানটা, মনে পড়ি গেল এতদিন বাদে স্বপ্নের ভিতর, আমি তা ওই খোকারে বলি দিলাম।

সত্যি! আবেগে বিস্ময়ে শম্পার চোখে জল।

মিথ্যে বলি আমার লাভ ! বলতে বলতে বিমল বিশ্বাস এগোয়।

এগার.

সত্যি? শম্পা চুপ করে অতীনের দিকে তাকিয়ে আছে।

সত্যিমিথ্যে জেনে লাভ? অতীনও যেন বিমল বিশ্বাসের কথার প্রতিধ্বনি করল। দু'জনে ঘরের ভিতরে চুপ। ঘরটা আচমকা যেন খালিই হয়ে গেছে। কেউ এসেছিল কি? মনে হচ্ছে না কেউ এসেছিল। বাইরে ঝড় বৃষ্টি থেমে আলো ফুটেছে। শম্পা এগিয়ে গিয়ে জানালা খুলে দিল। ব্যালকনির দরজা খুলে বাইরে। মেঘ আর বৃষ্টির পর, ঝড় কেটে যাওয়ার পর সারা পৃথিবী বুঝি এক অদ্ভুত হলুদ আলোয় ভরে যায়, তা গেছে এখন। চুঁইয়ে চুঁইয়ে আকাশ থেকে সেই আলো নেমে আসছে বাতাসের গায়ে। শম্পা ভিজে ব্যালকনি থেকে একটু ঝুঁকে বাইরেটা দেখল। যে এসেছিল সে কি দাঁড়িয়ে আছে নিচে? সে তো নেই। থাকবে কী করে? চলে গেলে কী থাকা যায়? ছায়া নিয়েই চলে গেছে সে। নেই তাই হলুদ আলোয় ছেয়ে গেছে সবদিক। তার ব্যালকনির বাম দিকে একটা নিম গাছ অনেক ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে। স্নানের পর কী সতেজ। তার ডালে ভিজে কাক ডানা ঝাড়ছে কয়েকটা। শম্পা ভিজে পায়ে ঘরে এল। বলল, কী অদ্ভুত, তাই না?

অতীনের মনে হচ্ছে ঘরটা আচমকা যেন খালি হয়ে গেছে। সমুদ্রের ঢেউ ফিরে যাওয়ার পর যেমন হয়, তেমনি। কী হচ্ছিল ঝড়ের সময়টুকুতে? প্রবল জলোচ্ছ্বাস! ঝড় এসে ফিরে গেছে। বিমল বিশ্বাস কি সত্যি এসেছিল, না কি বিমল বিশ্বাস আসুক তারা মনে মনে ভাবছিল তাই। অতীন উঠে পাশের ঘরে মানে অনির ঘরে যায়। দ্যাখে অনি ঘুমিয়ে পড়েছে। যাহ্! এই অবেলায় কি কেউ ঘুমোয়? কম্পিউটারে বসে নানা সাইটে প্রবেশ করার কথা তো এই সময়। সে ফিরে এল আবার বাইরের ঘরে। বিমল বিশ্বাস যে এসেছিল, তার কোন চিহ্ন সে রেখে যায়নি। তার মোটা পায়ের ছাপও পড়েনি শাদা মার্বেলের মেঝেয়। দরজা খুলে অতীন দেখল, কাদামাখা টায়ারের চটির ছাপও নেই সিঁড়িতে।

তাহলে? সে কি বাতাসে ভর করে এসেছিল? মাটিতে পা ফেলেনি? তার মেঝেতেও তার পা পড়েনি কি? বাতাসে পা রেখে রেখে এসেছিল বিমল বিশ্বাস? শম্পা কথা বলছে না। কিচেনে গিয়ে চা করছে। অতীন মনে মনে বুঝে নিতে চাইছিল বিষয়টা। শম্পা চা রাখে টিপয়ে। অতীন নিঃশব্দে চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ায়। শম্পা চায়ের কাপ নিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে। জানালা দিয়ে শেষ বেলার আলো দেখা যাচ্ছে। অনেকটা সময় বাদে অতীন বলল, অনি ঘুমোচ্ছে কেন অবেলায়।

ঘুমিয়ে পড়েছে, রাত জাগে তো। শম্পা বলল।

অতীন বলল, দুপুরে কি ঘুমোয় ও।

শম্পা বলল, ডেকে দেব?

অতীন মাথা নেড়ে বলল, না, থাক। তারপর অতীন বলল, ও চিরকালই অদ্ভুত।

কার কথা বলছ?

বিমল বিশ্বাস। বলল অতীন।

কই আগে বলনি তো?

কী করে বলব, ওর কথা মনে ছিল নাকি?

শম্পা বলে, কী রকম অদ্ভুত?

ও নাকি অনেক কিছু দেখতে পেত ঘুমের ভিতর।

কে বলত, বিমলদা? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

না, ওর ভাই কাশী।

তোমার আজ মনে পড়ল? শম্পা জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ, ও নাকি ঘুমের ঘোরে বকবক করত, এমন সব কথা বলত, যা শোনার জন্য ওর বাবা বসে থাকত।

তারপর?

স্বপ্নটা কখনো মনে থাকত, কথাগুলো না।

ও রকম হয়, এও একরকম পাগলামি। শম্পা বলল।

তা কী করে হবে, ওকে দেখে তাই মনে হয়?

শম্পা বলল, অন্য রকম তো মনে হয়।

তখনই অনি উঠে এল এই ঘরে, কেমন বিস্ময়ের ঘোর দু'চোখে, বলল, চলে গেছেন উনি?

হ্যাঁ, বৃষ্টি থেমে গেল যে।

অনি বসল মায়ের পাশে। যুবক হয়ে উঠেছে। পেশিবহুল শরীরে মেদ নেই। নিয়মিত ওয়ার্ক আউট করে। ঝলমলে প্রাণবন্ত তরুণ, বলল, বাবা, কী আশ্চর্য, আমি ঘুমিয়েও পড়লাম, ঘুম এসে যাচ্ছিল এখানে বসে, কোনদিন তো হয় না মা।

টায়ার্ড ছিলি মনে হয়। শম্পা ছেলের পিঠে হাত রাখে।

লোকটার অদ্ভুত চোখ, ইজ হি আ ম্যাজিসিয়ান? অনি বলে।

কেন? জিজ্ঞেস করে অতীন।

ঘুম এল ওকে স্বপ্ন দেখার জন্য।

তুই ওকে স্বপ্ন দেখলি? অতীন জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ বাবা, তাই।

শম্পা বলল, কী দেখলি?

আমি আর উনি কথা বলছি।

কী কথা বলছিলি?

আমি সবটা বলতে পারব না বাবা, কিছুটা মনে আছে, বাকিটা আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে, আই ওয়াজ টকিং উইথ হিম অ্যাট আ

ধর্মতলা স্ট্রিটের নামই তো বদলে লেনিন সরণি হয়েছে কিন্তু এখনো কত সব পুরনো দোকানে ওই ধর্মতলা স্ট্রিট লেখা আছে পুরনো সাইন বোর্ডে। ইংরেজরা কিন্তু কোন রাজপুরুষের নামে রাস্তার নামটা দেয়নি। ওখানে ধর্মরাজের থান ছিল, তা থেকেই ধর্মতলা হয়েছে, আসলে ধর্মরাজতলা।

রিমোট প্লেস, জায়গাটা আমি চিনি না, আমরা গান নিয়ে কথা বলছি, ডু ইউ নো বিজয় সরকার?

কে তিনি?

লোককবি, বাংলাদেশে তাঁর গান খুব হয়।

তুই নেটে দেখেছিস, ইউ টিউব, কিংবা ফেসবুক। বলল শম্পা।

না, আমাকে সে বলছিল, দ্যাট বিমল বিশ্বাস।

তা হয় নাকি, হতে পারে? শম্পা হাসে, তুই স্বপ্ন দেখিসনি, মনে হচ্ছে এমনি দেখেছিস, তুই ঘুমিয়েছিলি? জিজ্ঞেস করল শম্পা।

তাই কি, না না, স্বপ্ন আসতেই তো ঘুম পাতলা হয়ে ভেঙে গেল, আচ্ছা মা, লোকটা আমায় গান শোনাল, জায়গাটা তো ডুমুরিয়া হতে পারে, অ্যাকচুয়ালি আমি স্বপ্ন দেখছিলাম যে আমি কম্পিউটারে বসে আছি, ফেসবুক খুলেছি, অ্যান্ড বিমল বিশ্বাস অন লাইন হল, সে আমাকে কত ডুমুরিয়ার ছবি পোস্ট করতে লাগল, আমি ওকে ইন-বক্সে প্রশ্ন করছি, তখন মনে হচ্ছে আমি সেই নদীর ধারের গ্রামে চলে গিয়েছি, ইয়েস বাবা, এইটাই হয়েছে।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের সন্তানকে দেখছে অতীন। কী বলবে বুঝতে পারছে না। তবু জিজ্ঞেস করে, ইন-বক্সে কী লিখলি?

ভুলে গেছি তো, আমি যদি সেদিনের মত সত্যি সত্যি চ্যাট করতাম, সব তো রেকর্ড থাকত, বাট এইটা তো স্বপ্নের ভিতর হয়েছে, এর কোন রেকর্ড নেই, আমার মনেও নেই কিছু, কিন্তু বাবা আমার মনে হয়, সেই ধর্মতলার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে তুমি যাও, ওখানে রেকর্ডটা পেয়েও যেতে পার।

হ্যাঁ যাব। অতীন বলল।

একটু এগিয়ে লেনিন সরণিতেই দোকান আছে কয়েকটা। অনি বলল।

তুই দেখেছিস?

আমি একবার দেখেছি তোমাদের সঙ্গে ট্যাক্সি করে আসার সময়, সে অনেকদিন আগে, মনে হয় নন্দনে আমরা একটা সিনেমা দেখেছিলাম, আমি তখন আট-নয়, টেন কম্যান্ডমেন্টস, সেই মনে আছে সমুদ্র ভাগ হয়ে হয়ে গেল, মোজেস পার হয়ে গেল সমুদ্র, মনে আছে মা?

শম্পা বলল, ভুলেই গিয়েছিলাম তো।

তখন দেখেছিলাম মা, লেনিন সরণি দিয়ে ফেরার সময়, সিগনালে আটকে ছিল গাড়ি, আমি দেখেছিলাম রেকর্ড বাজছে, অবাক লেগেছিল, রেকর্ড তো আমাদের বাড়িতে বাজে না, দাড়িওয়ালা এক বুড়ো মুসলমান সেই গান বাজিয়ে নিজেই শুনছে, ফুটপাথটা ফাঁকা, সে চোখ বুজে আছে, আমি বলে উঠেছিলাম সম্রাট শাজাহান।

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে। শম্পা বলে উঠল।

অনি বলল, আমিও ভুলে গেছিলাম মা, আট-ন বছরের কথা কি কারো মনে থাকে, কিন্তু আচমকা সেদিন বিমল বিশ্বাস আমাকে গোলাম হুসেন, রেকর্ডওয়ালার কথা বলতে, মনে পড়ে গেল, আমার মনে হচ্ছে ওখানেই পাওয়া যাবে।

স্বামী স্ত্রী ও পুত্রের ভিতর কথা হতে হতে বেলা পড়ে যেতে লাগল। ক'দিন যা গরম পড়েছিল, দুপুরের ঝড়-বৃষ্টির পর সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সন্ধে হয়ে এল। আজ অনিকে যেন গল্পে পেয়েছে। আর অতীনকেও। শম্পাকেও। তিনজনেই বাল্যকালের কথা বলছে। অনিরটা তো অনতি অতীতের।

অতীনেরটা অনেক যোজন দূরে। শম্পারও কম নয়। অতীন বলল, ধর্মতলা স্ট্রিটের নামই তো বদলে লেনিন সরণি হয়েছে। কিন্তু এখনো কত সব পুরনো দোকানে ওই ধর্মতলা স্ট্রিট লেখা আছে পুরনো সাইন বোর্ডে। ইংরেজরা কিন্তু কোন রাজপুরুষের নামে রাস্তার নামটা দেয়নি। ওখানে ধর্মরাজের থান ছিল, তা থেকেই ধর্মতলা হয়েছে, আসলে ধর্মরাজতলা। কলকাতার গা থেকে যে সব পুরনো চিহ্ন উপড়ে ফেলা হয়েছে, মানুষ তা নিজের ভিতরে রেখে দিয়েছে। অনি মুগ্ধ হয়ে বাবার কথা শুনছে।

কোথাও নেই ধর্মতলা, কিন্তু মানুষের মনের ভিতরে ঠিক আছে। আছে বকুলবাগান, চালতাবাগান, মালোপাড়া, বাদুড়বাগান, জানিস তা অনি?

অনি বলল, আছে আছে আছে বাবা।

ধর্মতলাও আছে, কলকাতার পুরনো নামগুলো না বদলালেই হত।

শম্পা মাথা নাড়ে, তোমার একটু পুরনো পুরনো বাতিক আছে, ইদানীং এইটা হয়েছে, সব কি আগের মত থাকতে পারে?

তা কেন থাকবে, কিন্তু বয়স হলে কি মানুষ তার নাম বদলে ফেলে?

হ্যাঁ বাবা, এটা তো আমাদের ট্রাডিশনকে ভুলিয়ে দেওয়া, ঠিক না।

শম্পা বলল, মহাপুরুষ, যুগপুরুষ, গ্রেট ম্যানদের নামে কি রাস্তা হবে না?

হবে না কেন, কিন্তু ধর্মরাজকে কোপ দিতে হবে? তিনি এক লৌকিক দেবতা, তাঁর হয়ে কেউ কথা বলার নেই, তাই তাঁর নামটা বদলে দেওয়ায় অসুবিধে নেই। অতীন বলে।

আহা, এভাবে ভাবছ কেন? শম্পা বলে, রাস্তার নাম দিয়ে তো যুগপুরুষকে চিনবে মানুষ, জানতে চাইবে তাঁর কথা।

তা হয় নাকি, তাঁকে ওই ভাবে চিনতে হবে! দ্যাখো, লৌকিক দেবতাকে যদি না রেখে দি, শিকড়কে নষ্ট করে দেওয়া হবে না কি? অতীন বলতে লাগল, সারা পৃথিবী জুড়ে এখন শিকড়ের সন্ধান চলছে, রূপকথা, উপকথা, লোককথা, লৌকিক দেবতা ফিরে আসছে সাহিত্য শিল্প চর্চায়, আমি আমার অতীতকে নষ্ট করে দেব?

ইয়েস বাবা, কলকাতার বাবুদের নামে, বড়লোকদের নামে যে সব রাস্তা, তা কিন্তু রয়ে গেছে, ধর্মরাজ বেচারা ঠাকুর, গরিব মানুষের ঠাকুর, তাকে কলকাতা থেকে বের করে দেওয়া হল, ভেরি ব্যাড!

তিনজনের ভিতরে কথা হতে লাগল। কলকাতা শহরে সন্ধ্যা নামল।

● পরবর্তী সংখ্যায়

অমর মিত্র
সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারতীয় লেখক

Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola

অনুবাদ গল্প

সুখ

কাশীনাথ সিং

ভোলাবাবু অবসর নিয়েছেন এক সপ্তাহও হয়নি। তার মধ্যেই একটা ঘটনা ঘটে গেল।

তিনি ঘরে বসে কাগজ পড়ছিলেন। জানলা দিয়ে গোধূলির আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিকরে পড়েছে ভোলাবাবুর টাকভরা মাথায়। ছোট্ট শিশুর হাতের মত গরম ও তুলতুলে। ভোলাবাবু শুয়ে ছিলেন, উঠে বসলেন। দূরে তাকিয়ে দেখেন সূর্য পাহাড়ের অন্তরালে কোথায় যেন লুকিয়ে গেছে, কিন্তু সূর্যের কিরণ মিলিয়ে যায়নি– যেমন ছিল, তেমনি আছে।

ভোলাবাবু উঠে পড়লেন। সামনের দেওয়ালে হাতটা রাখলেন। কিছুক্ষণ আগে সূর্যের রঙ এখানে খেলা করছিল। হাত দিতেই উষ্ণ স্পর্শ পান। হাতটা নিজের গালে রাখলেন। গালের চামড়া থেকে হাতের তেলোর তফাতটা এক ইঞ্চির মত। মনটা বেদনার্ত হয়ে পড়ে। বাইরে বেরিয়ে পড়লেন।

বাইরে সবুজ ঘাসে লালের আভা; চারদিকের দেওয়ালে রঙের রক্তিম প্রভা।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে তিনি এগিয়ে যান। পাঁচিলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। এখান থেকেই সূর্য দেখা যাচ্ছে। ঐ পাহাড়ের কিছু ওপরে, যেখানে মেঘ-বৃষ্টি, তারই আশেপাশে– তাল ও বাবলা গাছের ফাঁকে। ভোলাবাবু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। মার্কিনের সাদা পাঞ্জাবি– গোলাপী হয়ে গেছে। দুনিয়ায় কত বিচিত্র সুন্দর জিনিস আছে ভেবে একটু মুচকি হাসলেন।

ভোলাবাবু চার দেওয়ালের বাইরে একবার তাকিয়ে দেখলেন। এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে আছে হরিজন বসতি। কুঁড়ে ঘরগুলো গোধূলির রঙে লম্বা দেখাচ্ছে। সুকালু গাছের মগডাল মন্দিরের গা ছুঁয়ে রয়েছে। মন্দিরের পাশে একটা গরু দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে। গরুটাকে খুব ভাল করে দেখলেন; গরুটার রঙ লাল কি সাদা, তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না। বাঃ! কি মজার ব্যাপার, আবার মুচকি হাসলেন ভোলাবাবু।

তাঁর নজর পড়ল সূর্যের দিকে। বৃত্তাকার রূপ, কাঁপছে, কখনও বড়, কখনও বা ছোট্ট, ভোলাবাবু চিৎকার ডাকলেন, 'এই যে বিট্টির মা।'

কোন জবাব পান না।

আবার চিৎকার করে ডাকলেন, 'ও বিট্টির মা।'

'কি হল?' আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বিট্টির মা বেরিয়ে আসে।

'আরে এদিকে এস না।'

বিট্টির মা ছুটে এসে ভোলাবাবুর পাশে দাঁড়াল।

'সামনে ওদিকে দেখ তো।' বিট্টির মা রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'রাস্তার দিকে নয়, ঐ দূরে তালগাছের পেছনে।' বিট্টির মা গোড়ালির ওর ভর দিয়ে দেখতে লাগল। ভোলাবাবুর দিকে মুখ ফিরিয়ে খুশিতে ভরে উঠল।

'কি সুন্দর, না?' ভোলাবাবু গদগদ হয়ে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, খুব চমৎকার'– বিট্টির মা বলে।

'খুব চমৎকার? কোনটা?' ভোলাবাবু ডান দিকে ঘুরলেন।

'খচ্চরগুলো ইট বয়ে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর মানুষগুলো পেছনে, এই তো।'

ভোলাবাবু খুব জোরে হেসে উঠলেন। 'স্ত্রী জাত তো! খচ্চর আর গাধা

ধুতি পরে লাঠিটা হাত নিয়ে ভোলাবাবু বেরিয়ে পড়লেন। তিনি নিজের মনে বিচার করতে লাগলেন, এটা একটা ছোটখাটো ব্যাপার নয় যে সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি আজ যাবেন, বলবেন। সবাইকে বলবেন। সবার আগে যাবেন মাধবের কাছে।

ছাড়া আর কী নজরে পড়বে?

'কী দেখতে বলছ?'

'কিছু না, যাও ঘরে গিয়ে ফেন গালো আর আটা মাখো।'

'না, আমাকে একটু দেখাও না,' জেদ ধরে বিট্টির মা।

'কি দেখাব ছাই? খচ্চর দেখাবার জন্যে এতক্ষণ পরিশ্রম করলাম?'

'তবে কি দেখাতে চাও?' বিট্টির মা জোর দিয়ে বলে ওঠে।

'তালগাছের ফাঁকে কিছু দেখতে পাচ্ছ? আবছা আবছা ঐ যে পাহাড়?'

'হ্যাঁ।'

'আর ঐ লাল– রঙিন সূর্য?'

'হ্যাঁ।'

'সূর্যের চারিদিকে বৃত্তাকার সোনালী মেঘ?'

'হ্যাঁ আছে।'

'তবে দেখ। প্রাণ ভরে দেখ।'

'এ আর কি দেখব। তুমি আজ দেখছ; আমি সারাজীবন ধরেই দেখে আসছি।'

'হুঁ'– ভোলাবাবু জোরে ঘাড় নাড়লেন। 'সারাজীবন ধরেই দেখছ?'

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা খুবই ভাল কাজ করেছ। এখন এক কাজ কর, যাও গিয়ে উনুন ধরাও।'

বিট্টির মা ভোলাবাবুর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'আমি বলছি... চলে যাও,' ভোলাবাবু খিঁচিয়ে উঠলেন।

বিট্টির মা ভয় পেয়ে পালাল।

ভোলাবাবু দু'চোখ মেলে তাকিয়ে রইলেন।

সূর্য, মেঘ, মেঘের নানা রঙ, রঙের বিচিত্র বর্ণরেখা, পাহাড়ের সামনের দিকের আবছা আলো, আবছা আলোর মাথায় ক্ষীণ হয়ে আসা কুয়াশার লাল আভা...

ভোলাবাবু সারাজীবন তার-বাবু হয়েই কাটিয়ে দিলেন। পাহাড়ী এই জেলাতেই থাকতেন। এমন গ্রাম নেই যা দেখেননি, এমন জেলা নেই যেখানে যাননি, এমন শহর নেই যেখানে তিনি ঘোরেননি। কিন্তু এই সূর্য! এই সূর্য এতদিন কোথায় ছিল? এই গোধূলি সন্ধ্যা এতদিন কোথায় ছিল?... ভোলাবাবু আজ এ কী দেখছেন?

একটি বাচ্চাকে খেলা করতে দেখে ভোলাবাবু ডাকলেন– 'কে রে, নীলু নাকি?'

নীলু লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এল।

'আর সব কোথায়?'

'খেলছে।'

'কোথায়?'

নীলু বাড়ির পেছনের ময়দানের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল।

'দৌড়ে যা তো। সবাইকে ডেকে নিয়ে আয়।' নীলু এক দৌড় দেয়।

ভোলাবাবু আবার সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকেন– কখনও এদিকে, কখনও ওদিকে কখনও গোড়ালির ওপর ভর দিয়ে, কখনও সামনের দিকে ঝুঁকে। আনন্দে তিনি হাততালি দিয়ে ওঠেন।

ভোলাবাবুর মনে হল বৃত্তাকার সূর্যের ওপরের ভাগে যেখানে কালো মেঘের পাতলা আঁচড়– সেটা ডুবে যাচ্ছে। সূর্যের কিরণ এখন এদিকে নেই, ময়দানে নেই, সবুজ ক্ষেতে নেই, কুঁড়ে ঘরে নেই। মেঘ পেরিয়ে আকাশ ছুঁয়ে সে চলে যাচ্ছে নানা বিচিত্র রঙে, নানা বিচিত্র ধারায়।

'নীলু'– ভোলাবাবু পেছন ফিরে চিৎকার করে ডাকলেন। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। ভোলাবাবু বিড়বিড় করে বললেন– 'গেল কোথায় সব?'

'আরে এ কে যায় রে?'

সামনের রাস্তা দিয়ে একটা উট যাচ্ছিল। উটের পিঠে ময়লা কাপড় জামা পরা একজন লোক নির্বিকার ভঙ্গিতে বিড়ি ফুঁকছিল।

'ওহে তোমাকেই বলছি।' উটের পিঠে বসে-থাকা লোকটি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল।

'এই যে সামনের দিকে– ঐ তালগাছের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখ তো। বল তো, ওখানে কি আছে।'

উট-ওয়ালা একবার ওদিকে তাকিয়ে আবার চলতে লাগল। ভোলাবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'শালা।'

সূর্য ডুবে গেছে। ভোলাবাবু ওদিক থেকে সরে গেলেন। চোখ বুজে আরাম কেদারায় চুপচাপ বসে পড়লেন। মনটা উদাস হয়ে গেছে।

চায়ের পেয়ালা আসে। সামনের টেবিলের ওপর রাখা হয়। ভোলাবাবু চোখ খুললেন। সামনে দাঁড়িয়ে বিট্টির মা।

'আমার ধুতি আর লাঠিটা নিয়ে এস তো।'

'কেন, কোথায় যাবে?'

ভোলাবাবু কোন উত্তর দিলেন না। ধুতি ও লাঠি এল। ধুতি পরে লাঠিটা হাত নিয়ে ভোলাবাবু বেরিয়ে পড়লেন। তিনি নিজের মনে বিচার করতে লাগলেন, এটা একটা ছোটখাটো ব্যাপার নয় যে সহজেই উড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি আজ যাবেন, বলবেন। সবাইকে বলবেন। সবার আগে যাবেন মাধবের কাছে। ঐ যে মাধব মোক্তার। ও সব জানে, সব বোঝে। তারপর ওকে নিয়ে যাবেন অন্য কোথাও।

ভোলাবাবু বটগাছের কাছে গিয়ে দেখেন বীজ গুদাম। কোথা থেকে জেলা সাহেবও এসে পড়েন। সেখানে আরও কয়েকজন ছিল। উনি ভেতরে ঢুকলেন।

'আসুন, আসুন, তার-বাবু বসুন,' জেলা অফিসার বললেন। ভোলাবাবু একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েন। বুড়ো মানুষের চোখে কয়েকটা নতুন মুখ ধরা পড়ে। ভোলাবাবুর উপস্থিতি কথাবার্তায় বাদ সাধে।

'কি খবর বলুন। আপনাকে যেন একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

'চিন্তিত ঠিক নয়, ঐ একটু,' ভোলাবাবু হাসবার চেষ্টা করেন। একটু বাদেই আবার আলাপ আলোচনা শুরু হয়ে যায়। জেলা অফিসার সাহেব বললেন, 'এবার খালে খুব মাছ উঠছে।'

অন্য একজন বললেন– 'জেলা সায়েব, মাছ ধরার সখ থাকলে আপনি একটা কাজ করুন।'

'কি?'

'রাত্রিবেলা ভরা নদীতে জাল ফেলুন।'

'হ্যাঁ সাহেব, রাত্রে মাছ ওঠে,' আর একজন মাথা নেড়ে সায় দেয়। ভোলাবাবু ভাবলেন এই সুযোগ।

তিনি এগিয়ে এসে বললেন– 'বিকেলে জাল ফেললে কেমন হয়?'

'হ্যাঁ, তাও করা যায়', জেলা অফিসার সায় দেন।

ভোলাবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন– 'বিকেল মানে ঠিক যখন সূর্য ডোবে?'

প্রথম লোকটি বলে ওঠে– 'আরে, বিকেল-টিকেল কিছুই না। মাছ ধরার সময় তো মাঝ রাত। আর সেটাই তো নিয়ম।

মাঝ রাতে মাছ ধরাই সবচেয়ে প্রশস্ত। ভোলাবাবু চেয়ারে হেলান

ভোলাবাবু ভাবেন কালও গোধূলির সূর্য দেখা যাবে। তিনি সবাইকে ডাকবেন। সূর্য দেখাবেন। তাদের বোঝাবেন, দেখ এই দুনিয়ায় উনুন, যোজনা, আদালত আর এই উট কিংবা দুধই সব কিছু নয়। সূর্যও আছে। ঐ পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওঠে, তাল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। কাঁপে। আবার সে মুহূর্তও আসে, যখন পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে যায়।

দিয়ে বসে পড়লেন। হাতে সুযোগ এসেও ফস্কে গেল। মনে খুবই ব্যথা পান। কিছুক্ষণ চুপচাপ। ভোলাবাবু ভাবলেন এত লোকের মাঝখানে বলাটা ঠিক হবে না। একা পেলে বলা যেত। ধৈর্য ধরে তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু কেউই ওঠার নাম করে না।

'জেলা অফিসার সাহেব'– ভোলাবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে বললেন। জেলা অফিসার ফিরে তাকাতে আবার বললেন– 'আপনার সঙ্গে একটু জরুরি কথা আছে।'

'আমার সঙ্গে?' জেলা অফিসার গম্ভীর হয়ে বলেন– 'আচ্ছা, বলুন।'

ভোলাবাবু উঠে পড়ে ইশারা করলেন। জেলা অফিসারও উঠে দাঁড়ান। ভোলাবাবু তাঁকে গুদাম ঘরের নীচে নিয়ে গেলেন। একেবারে নিরালায়। 'জেলা অফিসার সাহেব আপনার কাছে আর কি লুকাব। আর আপনি তো নিজেও সমঝদার।'

'আরে তার-বাবু আপনি যে কি বলেন!'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভোলাবাবু। তারপর বললেন– 'আপনি তো রোজ বিকেলে বেড়াতে যান, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আজকে আপনি নিশ্চয়ই সূর্য দেখেছেন।'

'হ্যাঁ দেখেছি।'

ভোলাবাবু খানিকক্ষণ অফিসারের দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। জেলা অফিসারকে নীরব দেখে বললেন– 'আজকে সূর্য কি চমৎকার ছিল না? জেলা অফিসার সাহেব, এত অপরূপ লাগছিল কি বলব! সারা পৃথিবী রঙে রঙিন হয়ে গিয়েছিল! আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন?'

জেলা অফিসার বললেন– 'এটা তো নতুন কিছু নয়। এরকম রোজই হয়। এটা তো রঙেরই ঋতু।'

ভোলাবাবু বিস্মিত হলেন– 'না সাহেব, রোজই কি এরকম হয়?'

জেলা অফিসার নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন– 'যাক সে কথা? কি ব্যাপার আগে সেটাই বলুন।'

ভোলাবাবু চুপ করে গেলেন। বেশ একটু নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। মাথা নীচু করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি হলেন।

জেলা অফিসার জিজ্ঞেস করলেন– 'ব্যাপার কি বলুন তো?'

ভোলাবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনাকে আর কি বলব সাহেব?'

ভোলাবাবু সোজা বাজারের দিকে চললেন। বাজারের এদিকটায় ততটা ভিড় নেই। রাস্তায় আলো। পরিচিত অপরিচিত লোক। ভোলাবাবু আপন মনেই চলেছেন। ভেবে বেরিয়েছিলেন যে সূর্যের সম্বন্ধে অনেককে অনেক কথাই বলবেন, কিন্তু আর কাউকেই কিছু বললেন না। খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। জেলা অফিসারের ঘরে কেন যে গিয়েছিলেন– সেটা ভেবে আরও কষ্ট হল। লোকে বলে জেলা অফিসার বুদ্ধিমান, যোগ্য লোক। শুনে শুনে তিনিও সে কথা বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আজ তাঁর আসল রূপ খুলে গেছে। যদি সূর্য না দেখতেন তাহলে অবশ্য অন্য কথা ছিল। কিন্তু তিনি সূর্য দেখেছেন এবং বেশ ভালভাবেই দেখেছেন।

ভোলাবাবু সব কথা বাধ্য হয়ে আবার নতুন করে ভাবতে লাগলেন। তাঁর মনে হল এ এমন একটা জিনিস যা সবাইকে বোঝানো যায় না, আর সবাই বুঝবেও না। এ কথা যত ভাবেন দুঃখ তত বেশি হতে থাকে। ধীরে ধীরে নিজেকে সান্ত্বনা দিলেন– হ্যাঁ, জেলা অফিসার অনেক পড়াশুনা করেছেন ঠিকই, কিন্তু শুধু পড়লেই কি হয়? বাস্তব জীবনে পড়া আর বোঝা তো এক জিনিস নয়... আর তা ছাড়া এটা এমন একটা বিষয় যা বুঝতে হলে বয়স আর অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

ভোলাবাবু মাধবের বাড়ির গলিতে ঢুকলেন। দেখলেন, হাতে একটা বালতি নিয়ে মাধব অন্য গলি দিয়ে আসছে। গলিটা একটু অন্ধকার। ভোলাবাবু চিৎকার করে ডাক দেন– 'মাধব।'

'বাবু, আমি সোহন।'

'ও তুমি। হ্যাঁ, তাতে কিছু এসে যাবে না,' তিনি সোহনকেই ডাকলেন।

সোহন বলল– 'মোক্তার সাহেব দুপুরবেলাতেই বাইরে গেছেন।'

'কোথায় গেছেন?'

'কাজে, একটা গ্রামে।'

'ও আচ্ছা, দুপুরবেলা থেকেই গায়েব বুঝি।'

'হ্যাঁ।'

আচ্ছা, তাহলে কোন্ জায়গা থেকে সূর্য দেখেছিল? ভোলাবাবু নিজের মনেই বিচার শুরু করেন। সোহনের দিকে তাকিয়ে ভাবেন এর বয়স কত, আর অনুভূতিই-বা কতটা হতে পারে।

ভোলাবাবু জিজ্ঞেস করলেন– 'তুমি বিকেল বেলা কি কর?'

'গোয়ালে যাই। খোল তৈরি করি। জাবনা বানাই, দুধ দুই আর...'

'সূর্য দেখিস?'

'সূর্য?' সোহন বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'তুই আজকে সূর্য দেখেছিলি?'

'কোন্ সূর্য? সূরজ তেলী?'

'না, তোর ঘানি! উজবুক কোথাকার,' ভোলাবাবু তেড়ে উঠলেন।

সোহন হাসতে লাগল। 'আমি পড়াশুনা জানি না বাবু। কি করে বুঝব, আপনি কাকে খুঁজছেন।'

'আমি আকাশের সূর্যের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ বাবু, দেখেছি।'

'তোর নতুন কিছু কি মনে হয়েছে?'

'তার মানে'– সোহন বোকার মত বলল।

'কিছুটা গোল-গোল, কিছুটা লাল-লাল,' ভোলাবাবু সোহনকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

'তো?'

'তোর মাথা,' ভোলাবাবু রেগে ওঠেন। 'আরও মোষ পাল।'

ভোলাবাবু ওখান থেকে চলতে লাগলেন। মনে যে ক্ষীণ আশার আলো ঝিলিক দিচ্ছিল তাও এবার মিলিয়ে গেল। রেগে উঠে তিনি যেন নিজেকেই জিজ্ঞেস করলেন– 'আমরা সত্যি কি হয়ে যাচ্ছি?'

বাড়িতে এসে দরজা খুলে ভেতরে এলেন। লাঠিটা রেখে বিছানায় শুয়ে পড়েন। হায়, দুনিয়া কত বদলে গেছে। বার বার একই কথা মনের মধ্যে ভিড় করে আসে।

ভোলাবাবু ভাবেন কালও গোধূলির সূর্য দেখা যাবে। তিনি সবাইকে ডাকবেন। সূর্য দেখাবেন। তাদের বোঝাবেন, দেখ এই দুনিয়ায় উনুন, যোজনা, আদালত আর এই উট কিংবা দুধই সব কিছু নয়। সূর্যও আছে। ঐ পাহাড়ের ওপর দিয়ে ওঠে, তাল গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায়। কাঁপে। আবার সে মুহূর্তও আসে, যখন পাহাড়ের পেছনে সূর্য ডুবে যায়। আর ডোবার আগে তার মোলায়েম কিরণে তোমার টাক মাথায় আলোর কণা ছড়িয়ে দেয়।

ভোলাবাবুর হঠাৎ মনে পড়ল। মাথায় হাত দিলেন। খুঁজলেন। ঐ

অংশটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। একটা কথা ভেবে তিনি আরও দুঃখিত হলেন– আগামী কাল এসব কথা বুঝতে পারবে এমন কে আছে– কত লোকই-বা আছে? তিনি নিরাশ হয়ে পড়লেন।

ঘরের ভেতরে কেউ যে এল ভোলাবাবু তা টের পেলেন। দেখলেন, টেবিলে খাবার থালা সাজানো আর চারপায়ের এক কোণে বিট্টির মা বসে।

'বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে?'

'কোথাও না', ভোলাবাবু অন্যমনস্ক হয়ে জবাব দেন।

'শরীর ভাল আছে তো?'

ভোলাবাবু কোন জবাব দিলেন না। বিট্টির মা চাদরের ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দুটো পায়ে হাত দিল। 'ঠিক তো আছি।' কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। এরই মধ্যে ঘরে এসে পড়ল বিট্টি, নীলু আর অন্য বাচ্চারা।

'এখন ওঠ, খেয়ে নাও।'

'আমি আজ খাব না।

বিট্টির মা বিস্মিত হল– 'কেন?'

ভোলাবাবু বেশ কিছুক্ষণ নীরব হয়ে রইলেন। তাঁকে উদাস ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে নিজেই বললেন– 'দেখ, বলতে গেলে আমার বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে, এই বাড়িটাও আছে, বিষয়-সম্পত্তিও কম নেই। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনও আছে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, কেউ কারো নয়।'

'তুমি এ সব কি বলছ?'– বিট্টির মার চোখ ছলছল করে উঠল।

'কেউ যখন আমার দুঃখ বুঝতে পারে না, তখন কিসের স্ত্রী, কিসের ছেলেমেয়ে?'

বিট্টির মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

'আমার আপন বলতে কেউ নেই'– ভোলাবাবুর গলাও ধরে আসে।

'না না, এসব তুমি কি বলছ? কি হয়েছে তোমার?' বিট্টির মা কান্নায় ভেঙে পড়ল। মাকে কাঁদতে দেখে বাচ্চারাও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

'এত কান্নাকাটির কি আছে? তোমরা যাও না, খাওয়া-দাওয়া কর। আমি খাব না। বিমর্ষ ভোলাবাবু পাশ ফিরে চুপচাপ শুয়ে পড়লেন।

বিট্টির মা বাচ্চাগুলির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখে জোরে কেঁদে উঠল। বাচ্চারাও চেঁচাতে শুরু করে।

ভোলাবাবু বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। একটু পরে কনুই-এর ওপর ভর দিয়ে তিনি উঠে বসলেন। বিট্টির মাকে এক ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলেন– 'বিট্টির মা, এসব কি হচ্ছে?'

বিট্টির মা কোনদিকে কান না দিয়ে আরও জোরে কান্না জুড়ে দিল। ভোলাবাবু কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখলেন এবং নিজেও কান্নায় ভেঙে পড়লেন। সবার মধ্যে ভোলাবাবুর স্বরই সবচেয়ে তীব্র ও করুণ শোনাচ্ছিল।

অনুবাদ **ইন্দ্রাণী সরকার**

লেখক পরিচিতি

রেহাঁ পার রঘ্‌ঘু উপন্যাসের জন্য ২০১১ সালে সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি হিন্দি সাহিত্যের একদা অধ্যাপক কাশীনাথ সিং-এর জন্ম ১৯৩৭ সালের ১ জানুয়ারি উত্তর প্রদেশের চান্দৌলির জিয়নপুর গ্রামে। কাশীনাথ মূলত গল্প-লেখক। তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প সংকলন *লোগ বিস্তরোঁ পর*। তাঁর *কাসি কা আসি* (২০০৮) বেনারসের বিভিন্ন ঘাটকে উপজীব্য করে লেখা। এর উপর ভিত্তি করে রচিত নাটক *কাশীনামা* দেশে-বিদেশে বহুল মঞ্চায়িত ও প্রশংসিত হয়েছে।

ঘটনাপঞ্জি ❖ সেপ্টেম্বর

শাবানা আজমি

০১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬ ❖ শ্রীল এসি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের জন্ম
০১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪ ❖ মৈত্রেয়ী দেবীর জন্ম
০৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ ❖ উত্তমকুমারের জন্ম
০৪ সেপ্টেম্বর ১৮২৫ ❖ দাদাভাই নওরোজির জন্ম
০৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ ❖ প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম
০৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ ❖ দার্শনিক সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণণের জন্ম
০৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ ❖ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম
০৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩৩ ❖ আশা ভোঁসলের জন্ম
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ ❖ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ ❖ সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৯ ❖ সুবোধ ঘোষের জন্ম
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬ ❖ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৫ ❖ মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম
১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৫০ ❖ শাবানা আজমির জন্ম
২২ সেপ্টেম্বর ১৫৩৯ ❖ গুরু নানকের জন্ম
২৩ সেপ্টেম্বর ১৮৪৭ ❖ আনন্দমোহন বসুর জন্ম
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯২০ ❖ মহাকাশ বিজ্ঞানী সতীশ ধাওয়ানের জন্ম
২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ ❖ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম
২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩ ❖ রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 yearsÕ relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications.

The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to fshoc@hcidhaka.gov.in & commerce@hcidhaka.gov.in

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ধারাবাহিক

চিলিকা হ্রদের দেশে

দীপিকা ঘোষ

ছয়.

পেছনের দরজা খুলে ব্যালকনিতে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, উত্তাল বঙ্গোপসাগর উচ্ছল জীবনের অশ্রান্ত আবেগ নিয়ে কূল ছাপিয়ে নিরন্তর আছড়ে পড়ছে সমুদ্র সৈকতের বিস্তীর্ণ ভূভাগ জুড়ে। দূরে আরও দূরে পাল তোলা ছোট ছোট জেলেনৌকোর ঝাঁক। তরঙ্গের পর তরঙ্গের ঘায়ে হৃৎপিণ্ডের রক্তস্রোতের মত ডোবা-ভাসার কুশলী খেলায় তারা লুকোচুরি খেলছে। সাগর সৈকতের উদ্দাম হাওয়ায় ডানা ঝাপ্টানির শব্দ। বৈরাগ্যের তাণ্ডব নৃত্যে চারপাশ ঝেঁটিয়ে যেন নিঃস্ব করে দিচ্ছে সে। পড়ন্ত বিকেলের রক্তলাল সূর্য সন্ধ্যার সামিয়ানা খুলে তখনো কালো করেনি আকাশটাকে। তখনো অস্তগামী সূর্যের সিঁদুররাঙা দেহ থেকে প্রবল প্রতাপ সাগরের জল মন্থন করে নিচ্ছে উদ্বেলিত রঙের ফোয়ারা। সেই অপরূপ দৃশ্য দেখতে দেখতে জীবনের অতন্দ্র স্লোগান শুনে আমরা দুজন নিচে এলাম দ্রুতপায়ে। দীনকৃষ্ণ সামনেই বসেছিল। হেসে জানতে চাইল–

কোথায় যাচ্ছেন স্যার? সমুদ্র দেখতে?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ হ্যাঁ দেখে আসুন। খুব ভাল লাগবে। বলেই সে তার স্বভাবজ ভুবনমোহন স্মিত হাসি উপহার দিল। পেছনের সিঁড়ি বেয়ে সাগর সৈকতের দিকে পা বাড়িয়েছিলাম দুজনে। সহসা সিঁড়ির সামনে এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে দৃষ্টি পলকেই অপলক। দেখি এক অপরিচিত স্বর্ণকেশী সুন্দরী বাজারের ভারী ব্যাগ দু'হাতে ঝুলিয়ে পেছনের গেট দিয়ে উঠে আসছেন ওপরে। এমন ঘটনা এখানে দেখতে পাব ভাবিনি। যদিও খানিক আগে এক হোয়াইট কালার ভদ্রলোককে দেখেছি, হোটেল লাউঞ্জে বসে একখানা ডেইলি নিউজপেপার পাঠ করছেন সুগভীর মনোযোগে। কিন্তু তারপরও ক্লান্ত চরণে শ্লথ ভঙ্গিতে দু'হাতে বাজারের দুটি ভারী ব্যাগ ঝুলিয়ে কোন স্বর্ণকেশী বিদেশিনী সুন্দরী সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসছেন ওপরে হোটেলের এমন পরিবেশে এই দৃশ্যছবি ভাবা যায় কখনো? একেবারে

কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক দীপিকা ঘোষের জন্মস্থান ফরিদপুর, বাংলাদেশ। বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। ছেলেবেলা থেকে লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। কবিতা দিয়ে শুরু। সমাজের বিচিত্র চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পরবর্তীকালে কথা-সাহিত্যে প্রবেশ। উপন্যাস, ছোটগল্প এবং প্রবন্ধ মিলিয়ে প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা একুশ।

ঢাকা, কলকাতা এবং উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও সংবাদপত্রে তাঁর ছোটগল্প, উপন্যাস এবং প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হয়।

মুখোমুখি হতে ভদ্রতা করলেন সরাসরি তাকিয়ে– হাই! তার ভদ্রতায় সাড়া দিয়ে পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে এলাম। কিন্তু গভীর কৌতূহলের আকর্ষণ জেগে রইল মনের কোনায়-কোনায়। আমার দৃষ্টির প্রখরতা সে মুহূর্তে বিদেশিনীর মনও কি ছুঁয়ে গেল একবার? কারণ অবারণ দৃষ্টির প্রবলতা দিয়ে স্বর্ণকেশীও দেখলেন আমাকে। ঘোষকে জিজ্ঞেস করতে নির্লিপ্ত জবাব এল– যতসব অদ্ভুত প্রশ্ন! কী করে বলব বাজারের ব্যাগ কেন হাতে রয়েছে তার? হয়তো আমাদের মত এই হোটেলে উঠেছেন কোন কাজের জন্য। অথবা অন্যকিছু। ওই অন্যকিছুর রহস্যই তখন খেলা করছিল মনের রাজ্যে। তাই বললাম– আমাদের মত কাজে এলে সবজি বোঝাই ভারী ব্যাগ কেন হাতে থাকবে? অন্য কারণ নিশ্চয়ই রয়েছে। থাকতেই পারে! কিন্তু সেসব নিয়ে তোমার তো মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই! তুমি এখানে ঘুরতে এসেছ, সব ঘুরে ঘুরে দেখবে, ব্যস!

কিন্তু আমার ঘুরে দেখার বিষয়বস্তু তো আর শুধুমাত্র সাগর হ্রদ আকাশ কিংবা এখানকার ভৌগোলিক পরিসীমানার ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান নয়। সেই দর্শনীয় বিষয়বস্তুর তালিকায় অপার আকর্ষণেই যুক্ত রয়েছে জগতের যাবতীয় বিষয়ের জানা-অজানা দিক। কারণ বিশ্বের প্রত্যেক সৃষ্টিকণায় অনুভূতির পরশ দিয়ে যে জানাশোনার পরিচয়, সেই চেনাজানার গভীরে ডুব দিতেই সুদীর্ঘ এই ভ্রমণযাত্রা। মনে মনে বললাম– আবার যদি স্বর্ণকেশী সুন্দরীর দেখা পাই তাহলে...।

বালির বিছানায় পা দিয়ে খানিকটা সামনে এগুতেই দেখা গেল চারটি কিশোর ছেলে তিন পাশ খোলা একটি জীর্ণ কুটিরের অভ্যন্তরে বেঞ্চির ওপরে বসে রয়েছে। সম্ভবত এককালে কুটিরটি সমুদ্রগামী জেলেদের রাত্রিবাসের আস্তানা ছিল। পরিত্যক্ত হওয়ায় আজ জীর্ণদশা প্রাপ্ত হয়েছে। উন্মত্ত হাওয়ার বেগে তার চালের বাঁধন থেকে পলিথিনের আলগা আচ্ছাদন ছিঁড়েখুঁড়ে উড়ে যেতে চাইছিল থেকে থেকে। ছেলেগুলো আমাদের দূর থেকে দেখতে পেয়ে প্রায় একসঙ্গে ছুটে এল। তাদের কারুর হাতে ছোট টিনের বাক্স। কারুর কাঁধে রঙচটা চটের ব্যাগ। এসেই একজন ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল– ম্যাডাম ভাল ডায়মন্ড আছে, নেবেন? এদের কাছে ডায়মন্ড? শুনেই ধন্দ লাগল মনে। জিজ্ঞেস করলাম– ডায়মন্ড? জেনুইন? হ্যাঁ ম্যাডাম! খুব ভাল কোয়ালিটির! আর খুব সস্তা! মাত্র দশ হাজার রুপি দিলেই দুটো পেয়ে যাবেন! বলেই সে স্ফটিকস্বচ্ছ সাদা বেদানার ছোট্ট দুটি দানার মত উজ্জ্বলদ্যুতি হীরকখণ্ড দেখাল আমাকে। বললাম– না রে এসবে আমাদের দরকার নেই। বালকের মুখের রেখায় রেখায় মিনতি ঝরে পড়ল– প্লিজ ম্যাডাম নিন! এত সস্তায় অন্য কোথাও পাবেন না! ইয়ার রিং বানিয়ে পরবেন, খুব ভাল দেখাবে আপনাকে! এবার ডক্টর ঘোষ হেসে বাংলায় মন্তব্য করল– বাঃ তৈলমর্দন করতেও শিখে গেছ দেখছি! এমন মন্তব্যে ছেলেটির কচি মুখের ওপর সঙ্গে সঙ্গেই হাসির ঝলক ঝিলিক মারল। একগাল হেসে বলল– স্যার আমিও বাঙালি! কিন্তু সত্যি বলছি, সাচ্চা মাল! হ্যাঁ সে তো বুঝতেই পারছি! তুমি একবারে খাঁটি বিচ্ছু! এখানে থাকিস কোথায়? ওই ওদিকে। কিনুন না স্যার! একেবারে খনির মজুরদের কাছ থেকে ডিরেক্ট কিনে আনা! আচ্ছা এগুলো না নিলে অন্যকিছু নিন তাহলে! রুবি, জেড, ক্যাটস আই...! ছেলেগুলোর মুখে তাকিয়ে মন বড় কেমন করছিল। এইটুকু বয়সেই ওদের সবার কাঁধে সংসার নির্বাহের গুরুভার চেপেছে সে কথা উপলব্ধি করে গলে যাচ্ছিল অন্তর। বললাম– আচ্ছা শুধু একটা ক্যাটস আই দে তাহলে। সেটা কিনতে গিয়ে অন্যদের মুখে তাকাতেই দেখি অসহায় মিনতির আকুলতা তাতে গড়িয়ে পড়ছে বিগলিত হয়ে। সবচেয়ে ছোটটির মুখে নজর ফেলতে নিঃশব্দে একটি ঝিনুকের পুতুল সেও এগিয়ে ধরল আমার দিকে। ঘোষ হাসলেন– কী আর করবে, নিয়ে নাও। তারপর অন্য দুজনের কাছ থেকেও কিনতে হল বাঁকা হয়ে যাওয়া শামুকের মালা আর একজোড়া বেঢপ সাইজের কাচের চুড়ি। ঘোষ জানতে চাইলেন– ওগুলো কোন্ কাজে লাগবে? হেসে উত্তর দিলাম– কাজে লাগাবার জন্য কি আর এগুলো কেনা?

মূল্য মিটিয়ে দিতে দিতেই চোখে পড়েছিল, অনতিদূরে বড় একটা ভিড় জমেছে হঠাৎ করেই। কাছেই একটি রাজস্থানী উট আর টাট্টু ঘোড়া দাঁড়িয়ে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি ক্ষুদে বিক্রেতারা দ্রুত ছুটছে সেদিকে। একজনের কণ্ঠস্বরে উড়িয়া ভাষায় তখনই উল্লাসভরে উচ্চারিত হল– এই চল্, চল্! শিগগিরি চল্! ওদের কাছে বিক্রি করতে হবে! কালকের সেই সাহেবরা আজও আবার এসেছে! ঘোষ এবার অর্থপূর্ণ দৃষ্টি ছুঁড়ে হাসলেন আমার মুখে তাকিয়ে– দেখলে তো? ওরাও তোমার চেয়ে স্মার্ট! সে তো হবেই! এতটুকু বয়সেই সংসারের জোয়াল কাঁধে চেপেছে যে! বলে হাসলাম আমি।

শুরু থেকেই চোখে পড়ছিল এক দঙ্গল শীর্ণদেহী কুকুর মাটিতে গন্ধ শুঁকে কিসের অনুসন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিরামহীনভাবে। কখনো লাফিয়ে পড়ছে মাছের মত। কখনো বালি খুঁড়ছে ধারালো নখের টানে। থেকে থেকে লড়াইও করছিল পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কাছে যেতে স্পষ্ট হল কারণটা। উন্মত্ত ঢেউয়ের তরঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ উঠে আসছিল দু'একটি ক্ষুদে লাল কাঁকড়া। কুকুরগুলোর অবিশ্রান্ত ছুটোছুটি তারই জন্য। তারই জন্য লড়াই করে কোলাহল। ভাগবাঁটোয়ারার হিসেব নিয়ে সংঘর্ষ আর দ্বন্দ্ব-বিবাদ। ওদের দিকে ভাল করে নজর ফেলতে বুকের তলায় ছুঁয়ে দিল কষ্টের অনুভব। দেখলাম, বুভুক্ষুতার বাস্তবতা প্রত্যেকের শরীর ঘিরে যন্ত্রণার চিহ্ন রেখে গেছে। ঘোষকে বললাম– আহা দেখেছ কতকাল ওরা পেট পুরে খায়নি! তাই দু'একটা ক্ষুদে কাঁকড়া নিয়ে ওদের এমন মারামারি! ওদের বোধকরি কেউ কখনো খেতে দেয়নি কিছু! জন্ম থেকে এভাবেই চলছে ক্ষুধার্ত জীবন! কাল সূর্যমন্দির থেকে ফেরার পথে কিছু শুকনো খাবার কিনে আনতে হবে। অন্তত একদিন ওরা পেট পুরে খেতে পাক! আচ্ছা এন। এখন সমুদ্র দেখ।

অফুরান সাগরের অমিত তেজের অফুরন্ত বিক্রমে দৃষ্টি ছুঁয়ে দিলাম। কিন্তু কী করে দেখব এই জীবনমত্ত সমুদ্রকে? যেখানে কোনমতে বেঁচে থাকার কঠিন সংগ্রামে সামনের আর্ত জীবগুলোর জীবনযন্ত্রণা সাগরের ঢেউয়ের মতই আছড়ে পড়ছে আকুল হয়ে, সেখানে বিশাল ব্যাপ্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে কেমন করে অনুভব করব মহাজীবনের জয়গান? সাগর দেখে অনুভূতির জাগরণ তাই আর ঘটল না। তার বদলে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, স্যুটকেসে শুকনো খাবারের দুটি বড় প্যাকেট এখনো পড়ে রয়েছে না খোলা অবস্থায়। ছুটে গিয়ে সে দুটো নিয়ে এলাম হোটেল রুম থেকে। এনে মুখ খুলে হরির লুটের মত ছড়িয়ে দিলাম বালিভূমের ওপরে। মুহূর্তে বুভুক্ষুদের উপবাস ভঙ্গের মহোৎসব শুরু হয়ে গেল দুই জোড়া চোখের

সামনে। অনেকটা দূর থেকে আরও একটি ক্ষুধার্ত কুকুর খাবারের গন্ধ পেয়ে ছুটে এসেছিল মহোৎসবে। সঙ্গে সঙ্গে ভয়াল রুদ্ররূপের ঝাণ্ডা তুলে এরা সবাই মিলে একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই বেচারার ওপরে। এদের মধ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্তের মত এক নেড়ী কুকুরও ছিল। সম্ভবত কোন নৃশংস মানুষ কোমরসমেত ভেঙে দিয়েছিল তার পেছনের পা দুটোকেও। সামনের পায়ে ভর করে পুরো শরীরটা কোনমতে টেনে-হিঁচড়ে তাই হেঁটে বেড়াচ্ছিল সে। আমার অন্তর এতক্ষণ তারই প্রতি সমব্যথিত ছিল সবচেয়ে বেশি। তাকেও দেখলাম, অন্যদের মত অসহায় জীবটির ওপরে অমিত বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ে নৃশংস হতে হতে প্রবল বন্যতায় ফেটে পড়তে চাইছে। মনে মনে বললাম– যেখানে মানবসৃষ্ট জড় সভ্যতায় জড় দেহটার প্রাধান্যই শুধু অস্তিত্বের পরিচয় বহন করে, সেখানে পশুদের ক্ষেত্রে অন্যথা কী করে আর হতে পারে? ওদের সংস্কৃতিতে আজ অবধি তো সভ্যতার ছোঁয়াই লাগেনি! ঘোষ পেছন থেকে ব্যাকুলভাবে চেঁচালেন– এই সরে এস! কামড়ে দেবে! শিগগিরি সরে এস এদিকে! কিন্তু ওই কুকুরটাকে এরা মেরে ফেলবে যে! মারমারি ঠেকাতে হবে তো! তুমি কি ক্ষেপেছ? কুকুরের মারামারি মানুষে ঠেকাতে পারে?

মানুষ যে কী পারে আর পারে না, সেই হিসেব জগতে আজও মেলাতে পারেনি কেউ। পারলে জগতের চেহারাটাই সম্ভবত অন্যরকম হয়ে যেত এতদিনে। এই সুবিস্তৃত সাগরপারে দলে দলে হররোজ অজস্র মানুষের ভিড় জমে। তাদের থেকে সামান্য সংখ্যকও যদি প্রতিদিন জীবগুলোকে যৎকিঞ্চিৎ খেতে দিতেন, বুভুক্ষুতার যন্ত্রণা কদর্য নিষ্ঠুরতায় তাহলে এমনভাবে চিহ্ন রাখতে পারত না এদের জীবন ঘিরে। একটু আগে ছড়িয়ে দেওয়া যৎসামান্য খাদ্যবস্তু মুহূর্তে উড়ে গেল যাদুকরের ভোজবাজির মত। অতৃপ্তির হাহাকারে চারপাশে ভিড় জমিয়ে তীক্ষ্ণ চোখের উদগ্রতায় এরপর ওরা এমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে জিভ নাড়াতে লাগল, যেন আমি নিজেই তখন একটি পরিপূর্ণ খাদ্যভাণ্ডার। ওদের আচরণ লক্ষ্য করে কোমল গলায় বললাম– এখন যা তোরা! কাল অনেক খাবার নিয়ে এলে পেট পুরে খাস সবাই! এখন আর নেই কিছু!

এমন আশ্বাসে কী বুঝল কে জানে। সামনে থেকে সরে গিয়ে সবাই একসঙ্গে অদূরের একজোড়া তরুণ-তরুণীর সামনে এসে আগের মতই হাপিত্যেশে ফের লেজ নাড়াতে লাগল। ছেলেমেয়ে দুটি খানিক আগেই সৈকতভূমির ভেজা বালির স্তূপে এসে দাঁড়িয়েছিল স্খলিত চরণ ছুঁয়ে ছুঁয়ে। স্খলিত চরণে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে চানাচুর কিংবা ওই জাতীয় কিছু খাবার প্যাকেট থেকে মুখে ঢালছিল বারবার। খেতে খেতে সাগর দেখছিল গভীর মনোযোগে। কথাও বলছিল চারপাশের প্রতি উদাসীন হয়ে। কোন্ বুভুক্ষু আকুল তীব্রতায় আপাদমস্তক ক্ষুধাগ্নি নিয়ে এক কণা খাদ্যের জন্য অপেক্ষমাণ প্রত্যাশা জিইয়ে রেখে, সেদিকে নজর ফেলার ফুরসৎই ছিল না। কে জানে, তারা হয়তো তখন ভালবাসার কথাই বলছিল কিনা বিবশ আবেগের চুম্বন রেখে। যে ভালবাসা সহানুভূতির সহমর্মিতায় ফুলের সৌগন্ধে ছড়িয়ে দিয়েও পারিপার্শ্বিকতা ভুলে যায় মহাভারতের মহানায়ক, লক্ষ্যস্থির অর্জুনের মত।

হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গিয়েছিলাম বিখ্যাত গোল্ডেন বিচের কাছে। লোকে লোকারণ্য চারপাশ। ছেলেবুড়ো-নারীপুরুষ সবাই মত্ত মহানন্দে। তখন তারা সেই রাজস্থানী উট আর টাট্টু ঘোড়ার সওয়ার বহনের দৃশ্য দেখছিলেন কৌতূহলী হয়ে। বেচারা উট নিজের পৃষ্ঠদেশে সওয়ার নিয়ে কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না মাতালমত্ত বঙ্গোপসাগরের ঢেউয়ের পরশ ছুঁয়ে যেতে। কিন্তু দর্শককে মালিক সেই দৃশ্যই দেখিয়ে ছাড়বেন, যে দৃশ্যে মরুভূমির জীব নির্দ্বিধায় দুঃসাহসে সাগর জলে পা ফেলে সামনের দিকে অগ্রসর হতে হতে প্রমাণ করে ছাড়বে কী বৃহৎ মাপের কুদরতির কসরতই না মালিক তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমার পাশ থেকে এক প্রবীণ ভদ্রলোক বিরক্তি নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন– বেচারা এত ভয় পাচ্ছে, শুধু শুধু তাকে জলের দিকে ঠেলে দেওয়া কেন? জবাবে তার সঙ্গের একই বয়সের প্রবীণের মন্তব্য ধ্বনিত হল সঙ্গে সঙ্গে– নিজের কেরামতি জাহির করতে হবে তো! জগতে মানুষ নিজের কেরামতির ভাগ আর কাউকে দিতে তো প্রস্তুত নয়! তাতে অন্যের অসুবিধে থাকলেও পরোয়া নেই!

বাঁদিকেও ছোট খাটো একটি ভিড় নজরে পড়েছিল ওই সঙ্গে। কয়েক পদক্ষেপ এগিয়ে যেতে দেখি পাহাড়প্রমাণ ঢেউয়ের মাথায়-মাথায় দুটি কচি ছেলে শোলার তৈরি পুতুলের মত পদ্মাসনে বসে থেকে ডোবা-ভাসার মরণদোলায় দুলছে। দেখেই মুহূর্তে হিম হয়ে গেল বুকের রক্ত! মনে হল, নিজের জীবন বাজি রেখে এমনতর সর্বনাশের দুঃসাহসী খেলায় কেন এরা এভাবে ব্রতী হতে চাইছে? এই প্রবল প্রতাপ জলরাশির শৃঙ্খলিত ঢেউয়ের টানে কতক্ষণ সম্ভব হবে তরঙ্গের মাথায় ভেসে থাকা? ভয়ে উদ্বেগে উতরোল অন্তর নিয়ে পরক্ষণেই প্রশ্ন রাখলাম ঘোষের কাছে– এই হৃদয়দীর্ণ দৃশ্য কী করে উপভোগ করছে তীরের মানুষগুলো? যদি এক্ষুনি এই দানব ঢেউ ছেলেদুটোকে টেনে নিয়ে যায় রাক্ষুসে টানের বেগে, তাহলে...? প্রশ্ন সমাপ্তির পূর্বেই পাশ থেকে এক ভদ্রমহিলা স্পষ্ট বাংলা ভাষায় হেসে বললেন– অত উদ্বিগ্ন হবেন না! প্রথমদিকে আমিও খুব শকড্ হয়েছিলাম ছেলেদুটোর কাণ্ড দেখে! পরে বুঝেছি, ওরা সারাদিন ধরেও পদ্মাসনে বসে থেকে দুর্দান্ত ঢেউয়ের মাথায় এভাবে ভেসে থাকতে পারে! ওদেরকে কেউ সাধারণ মানবশিশু বলে ভাবে না! ভদ্রমহিলার নাগাল থেকে সরে আসতেই ঘোষের কণ্ঠে এবার বিরক্তি ঝরে পড়ল– সবকিছু অত নেগেটিভলি নিলে কেমন করে এনজয় করবে? ততক্ষণে ভদ্রমহিলার কথায় স্বস্তির নিঃশ্বাস আমার বুকের মধ্যে। বললাম– এখানে নেগেটিভ-পজেটিভের কিছু নেই!

আমি শুধু বলতে চাইছিলাম, এতবড় কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজে কেন ওদের বাধা দিচ্ছে না কেউ? শুনলে তো, এসবে ওদের অভ্যাস আছে! কিন্তু সাগরের ঢেউয়েরও তো অভ্যাস আছে, সবকিছু টেনে-হিঁচড়ে অতলে টেনে নেবার! হাঁটতে হাঁটতে চোখে পড়ছে, পরিব্যাপ্ত চারপাশ জুড়ে অবর্ণনীয় সূর্যাস্তের আলো রক্তিমাভা লেপে দিয়েছে ততক্ষণে। মনে হচ্ছে পৃথিবীর অপর প্রান্তের অন্য কোন অচেনা জগৎ সেটি। অনিন্দ্যসুন্দর স্বপ্নের মায়া থেকে সবেমাত্র উৎসারিত হয়েছে অকস্মাৎ। সৈকতভূমের উঁচু পার ধরে আরও উঁচুতে উঠে আসতেই বদলে যাওয়া দৃশ্যাবলী কেড়ে নিল চোখের আকর্ষণ। যেদিকে দৃষ্টি ছোঁয়াই সবই যেন অচেনা রূপের অজানা রহস্যে ঘেরা। নিম্নে অফুরন্ত জলরাশির অন্তরে লক্ষ যুগের উন্মাদনা। উর্ধ্বে আলোকস্নাত রাঙা আকাশের নিচে এই মায়াময় ধরণীর স্বপ্নবিহার। সহসা এক আশ্চর্য বাস্তবতা থামিয়ে দিল চলার গতি। একজন ত্রিশোর্ধ্ব তরুণ, নির্মোহ বালির স্তূপে একটি অসাধারণ শিল্পকর্ম অনবদ্য আবেদনে ফুটিয়ে তুলছিলেন শিল্পের অভিপ্রেত চারুকলার কৌশলে। চারপাশে শিল্পীর চেয়েও বয়সে তরুণ গুটিদশেক ছেলেমেয়ে অব্যর্থ ভাললাগার সহনশীলতা দিয়ে একাগ্র মনোসংযোগে প্রতিটি মুহূর্তে লক্ষ্য করছিল শিল্পীর গাঢ়তম অধ্যবসায়। সৃষ্টিকর্ম দেখতে দেখতে শ্রদ্ধায়, ভাললাগায়, ভালবাসায় মুখ থেকে অজান্তেই বেরিয়ে গেল– বাঃ! অসাধারণ!

ছেলেমেয়েরা মন্তব্য শুনে পলকহীন তাকাল আমাদের মুখে। সবার মুখের রেখায় রেখায় তৃপ্তির নিটোল হাসি ফুটে উঠল অরুণোদয়ের স্নিগ্ধ আলোক হয়ে। বললাম– কিন্তু এমন অপরূপ শিল্প সৃষ্টি এই সাগরসৈকতে কেন? দুরন্ত বালির ঝড়ে একটু পরেই তো ভেঙে যাবে অপরূপ চারুকলার সবটুকু সার্থকতা! এই মন্তব্য শুনে শিল্পী সহসা মুখ তুলে তাকালেন। বললেন– একটু পরে ভেঙে গেলেই-বা অসার্থকতা কোথায়? এই যে সামনের সাগর জলরাশি, প্রতি পলকে তরঙ্গ সৃষ্টি করতে করতে পরক্ষণেই ভেঙে পড়ছে বিস্তীর্ণ তীরে এসে, সেও তো অপরূপ শিল্পসৃষ্টিরই অনিন্দ্য কারুকাজ! ভাঙনের ভেতরেই তো সৃষ্টির বীজ! আমি 'ভুবনেশ্বর বি কে কলেজ অফ আর্টস এন্ড ক্রাফটস্'-এর শিক্ষক। এরা আমার ছাত্র। বলেই নমস্কারের ভঙ্গিতে তিনি হাত তুললেন।

তরুণ শিক্ষকের মন্তব্য শুনে সেই আসন্ন সন্ধ্যার আলোছায়ায় আরও একবার গভীর দৃষ্টিপাতে মহাসাগরকে দেখলাম আমি। দেখলাম, একজোড়া ছেঁড়া স্যান্ডেল বৈরাগ্যের তীব্রতায় সাগরসৈকতে ছুঁড়ে দিল আলুলায়িত সাগরের অদৃশ্য দুটি হাত। মনে পড়ল কবিগুরুর কবিতার লাইন– 'কুড়ায়ে লও না কিছু করো না সঞ্চয়/ তুমি তাই পবিত্র সদাই'। শিল্পের বিশ্লেষক আমি নই। সাদা চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না সৌন্দর্যের সব মাহাত্ম্য। কিন্তু শিক্ষকের সুগভীর মানস ছুঁতে গিয়ে হঠাৎই যেন বোধোদয় হল, শিল্প যদি ত্যাগের সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে মহাকালের আশীর্বাদ তাতে কখনোই পড়ে না এবং তখনই সে হারিয়ে ফেলে সৃষ্টির সার্থকতাও। মহাকবি তাই বোঝাতে চেয়েছিলেন– নির্মোহ ত্যাগের সৌন্দর্যই পারে পবিত্রতার স্পর্শ দিতে। আর পবিত্রতার বন্ধনহীনতাই বারংবার সৃষ্টি করে নব নব সৃষ্টির বীজ। নব নব সৃষ্টির তরঙ্গ। ভারতবর্ষ চিরকাল এই ত্যাগের আদর্শ আর মাহাত্ম্যকে তাই প্রচার করেছে অন্তরাত্মা দিয়ে। তরুণ শিক্ষক একটু আগেই যে কথা আমাদের স্মরণ করালেন।

চলতে চলতে বুকের ভেতর উদাসী হাওয়ার পরশ বইছে। মন উড়ে যাচ্ছে সর্ব বাঁধন ছিঁড়েখুঁড়ে, মহাকাশের অসীম পারে। মুক্তির আনন্দ কি একেই বলে? যে মুক্তির কথা বারংবার ঘোষিত হয়েছে জীবনপ্রাজ্ঞ মহাযোগীদের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে? ব্যস্তময় রাজপথের অন্যপ্রান্তে উঠতে গিয়ে হঠাৎই লেলিহান অগ্নিবলয়, কুণ্ডলায়িত ধূম্রশিখায় নজর কেড়ে নিল। আগে থেকেই জানা ছিল, এই মহাসাগরের অল্প দূরেই শতাব্দীর সেই মহাশ্মশান! যে মহাশ্মশান প্রতিমুহূর্তে জানিয়ে দেয়– শেষ নেই! শেষ নেই! মৃত্যুর শেষ নেই! শেষ নেই জীবনের! জীবন-মৃত্যুর মাঝখানের বন্ধনহীন পথ ধরে নিরন্তর শুধুই আসা-যাওয়া। ফিরে ফিরে যাওয়া আর ফিরে ফিরে আসা এবং এখানেই অপরূপ শিল্পসৃষ্টির অনিন্দ্য কারুকাজ!

• পরবর্তী সংখ্যায়

দীপিকা ঘোষ
প্রবাসী বাঙালি কথাসাহিত্যিক

ঈশ্বরপ্রতিম সুনীল

নান্টু রায়

অনেক সময় আমি বলি, ঈশ্বরকে আমি খুব কাছ থেকে দেখেছি। কথাটা বলি আসলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে মনে করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার কাছে ঈশ্বরপ্রতিম। তখন আমি *দৈনিক বাংলার বাণী*র কনিষ্ঠ সহ-সম্পাদক। বেলাল ভাইয়ের সঙ্গে লেগে থাকি আঠার মত। সেভাবেই ঢাকা-কলকাতার তাবড়-তাবড় কবি-লেখকদের সঙ্গে আমার পরিচয়, যোগাযোগ। একদিন অসম সাহসে ভর করে তাঁকে লিখে ফেললাম একটি চিঠি, তাঁর দুই কালজয়ী উপন্যাস *সেই সময়* ও *পূর্ব-পশ্চিম* সম্পর্কে আমার অভিমত জানিয়ে। এখন ভাবি, কত বালখিল্য ছিল সেই আচরণ! আশা করেছিলাম, তিনি উত্তর দেবেন। দিন যায়, চিঠি আর আসে না। ওরকম কত চিঠি তো তিনি পান প্রতিদিন, হয়তো ফেলে দিয়েছেন! একদিন রাতের শিফ্‌টে অফিসে ঢুকতেই হইচই– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তোমাকে চিঠি লিখেছেন। হ্যাঁ, দেশ-নামাঙ্কিত সেই বিখ্যাত পোস্টকার্ড, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের হাতে লেখা চিঠি। আমার মত অর্বাচীনকে তিনি উপেক্ষা করতে পারতেন অনায়াসে– তিনি যে করেননি, তাঁর মহত্ত্ব এখানেই। সেই শুরু। তারপর ওঁরা সবাই– সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, স্বাতী বউদি, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়– এরকম বড় একটা দল এলেন ঢাকায়। এক দুপুরে আমি একটা ঢাউস টেপরেকর্ডার নিয়ে বেলাল ভাইয়ের অফিসে হাজির, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার নেব। বেলাল ভাই নিমরাজি হয়ে নিয়ে গেলেন ধানমন্ডি লেকের অপর পারে এক গেস্ট হাউজে– বোধহয় 'হংস' ছিল তার নাম। ভীড়ে-ভীড়াক্কার! তারই ফাঁকে বেলাল ভাই আমার অভিপ্রায়ের কথা তাঁকে জানালেন। গরমের দিন। বিকেল তিনটে-সাড়ে তিনটে বাজে তখন। সবাই বেড়াতে বেরুচ্ছেন। দেবদুলালবাবুর সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম, তিনি অতিকায় টেপরেকর্ডারটি দেখেই বোধহয় দৌড়ে পালালেন। বউদি এলেন তৈরি হবার তাগাদা দিতে। তিনি বললেন, তোমরা যাও। আমার ভাল লাগছে না এ রোদে-গরমে বেরুতে। তারচে' বরং আমি এই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলি। সবাই চলে গেলেন– বেলাল ভাইও। শুধু আমি আর সুনীলদা বসে রইলাম সেই বিরাট শব্দধারণ যন্ত্রটির সামনে। টেপ রেকর্ডার চালু করে প্রশ্ন করতে শুরু করলাম। মনে আছে, প্রথমে মার্কসবাদ সম্পর্কে একটা তাত্ত্বিক প্রশ্ন– তার কিছুদিন আগে *দেশ* পত্রিকায় তাঁর এতদ্‌সংক্রান্ত একটা প্রবন্ধ থেকে পেয়েছিলাম জিজ্ঞাস্যটি। উনি কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। যাই হোক, সেই আলাপপর্ব চলল সন্ধ্যাতক। উনি বললেন, ছাপা হলে যেন তাঁকে পাঠাই। আমি সবেগে ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে এলাম, যেন বিশ্বজয় করেছি। বাসায় এসে টেপ রেকর্ডার অন করলাম, ট্রান্সক্রিপশন শুরু করব। কিন্তু একি! শব্দধারকটি শুধু নৈঃশব্দই ধারণ করেছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এখন কী হবে? মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে শুরু করলাম, কীভাবে কথা শুরু হয়েছিল, প্রশ্নপত্রের সেই খসড়াটা সঙ্গেই ছিল। সব মিলিয়ে দাঁড় করালাম সেই সাক্ষাৎকারপর্ব। আমার বিশ্বাস, দাঁড়ি-কোমা-সেমিকোলনসমেত তাঁর পুরো সাক্ষাৎকারই আমি স্মৃতিকোষ থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলাম। *ঢাকা* নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল সেই সাক্ষাৎকার। তাঁকে পাঠিয়েছিলাম। সম্পর্কের সেই সূত্রপাত।

ইতোমধ্যে *অক্ষরবৃত্ত* নামে একটা প্রকাশনা শুরু করেছি তিন সাংবাদিক বন্ধুর সঙ্গে। সেটা সম্ভবত ১৯৯৩। প্রকাশ করেছি তাঁর নাতিদীর্ঘ উপন্যাস *জীবনীর দু'রকম খসড়া*। আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর নির্বাচিত কলাম থেকে *আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী?* শীর্ষক বই প্রকাশ করেছি– হট কেকের মত বিক্রি হচ্ছে। *জীবনীর দু'রকম খসড়া*রও বিক্রি ভাল। সময় গড়িয়েছে। ততদিনে *অক্ষরবৃত্ত* কিছুটা দাঁড়িয়ে গেছে। সুনীলদা ঢাকায় এলে রয়্যালটি বাবদ তাঁর হাতে তুলে দিলাম কিছু টাকা। তিনি খুশি হলেন। বললেন, ভাল কাজ করেছ। জীবনীর দু'রকম খসড়া কলকাতাতেও কেউ বই আকারে প্রকাশ করেনি। প্রকাশের জন্য তাঁর আরো কিছু বই চাইলাম। তিনি 'নীললোহিত' ছদ্মনামে লেখা তাঁর সব বইয়ের প্রকাশনার দায়িত্ব *অক্ষরবৃত্ত*কে লিখে দিলেন। কিন্তু হায়, নীললোহিতের কোন বই-ই *অক্ষরবৃত্ত* প্রকাশ করতে পারেনি। বাঙালির অন্যসব যৌথ ব্যবসায়ের মত *অক্ষরবৃত্ত*ও দু-তিন বছর পর ঝিমিয়ে পড়ে।

ঢাকার একটি প্রকাশনা সংস্থা বছরতিনেক আগে আমাকে তাদের প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব দেয়। মনে হল, এখান থেকে নীললোহিতের বইগুলি প্রকাশ করতে পারি। তাতে আমার ঈশ্বরকেই স্মরণ করা হবে। ২০১২ সালের দুর্গাপুজোর সময়ে যে না-ফেরার দেশে তিনি চলে গেলেন, সেখান থেকে অন্তত জানুন, তাঁর এক অকিঞ্চিৎকর ভক্ত তাঁকে অনুক্ষণ স্মরণ করে চলেছে।

উপরে

০১. ১৯ আগস্ট ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার মহামান্য রাষ্ট্রপতি শ্রী প্রণব মুখার্জির প্রয়াতা স্ত্রী শ্রীমতী শুভ্রা মুখার্জির প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর জন্মস্থান নড়াইলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ০২. প্রয়াতা শুভ্রা মুখার্জির পরিজনদের সঙ্গে হাই কমিশনার ০৩. ২৮ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'দক্ষিণ এশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষতা গণতন্ত্র ও লিঙ্গ সমতা' শীর্ষক দুই দিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে হাই কমিশনার বলেন, 'আমাদের নিজেদের গন্তব্য নির্ধারণে স্বাধীনতা পেতে আমাদের জনগণের সংগ্রাম থেকে ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশের জনগণ উদ্বুদ্ধ হয়েছে।...' ০৪. ১০ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় হাই কমিশনার ও রেলওয়ে বোর্ডের অতিরিক্ত সদস্যের যৌথভাবে বাংলাদেশে ভারতীয় রেলওয়ের প্রথম জেনারেল সেলস এজেন্ট অফিসের উদ্বোধন

নিচে

০১. ৭ আগস্ট ২০১৬ বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার বাংলাদেশ ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বাংলাদেশের তরুণ ফরেন সার্ভিস কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় ০২. ১১ আগস্ট ২০১৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে 'ইন্ডিয়া@বাংলাদেশ' শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার চিত্র প্রদর্শনী পরিদর্শনরত হাই কমিশনার শ্রী শ্রিংলা ০৩. ৩০ আগস্ট ২০১৬ ভারতীয় হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার মিরপুরে দৃষ্টিহীনদের পুনর্বাসন ও শিক্ষা উন্নয়ণ সংস্থা (বিইআরডিও)-র প্রশিক্ষণ ও নির্মাণ সুযোগ-সুবিধার উন্নয়নকল্পে একটি টাটা মাইক্রোবাস হস্তান্তর ০৪. ৩১ আগস্ট ২০১৬ ঢাকায় হাই কমিশনারের ডিফেন্স সার্ভিস কম্যান্ড এন্ড স্টাফ কলেজে 'সমকালীন ভারত, এর বৈদেশিক নীতি ও নিরাপত্তা কৌশল: বাংলাদেশের জন্য তাৎপর্য' শীর্ষক বক্তব্য প্রদানের পর কলেজের কর্মকর্তাদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra September 2016

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এখন থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকার উত্তরাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, ঢাকার বাইরের এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত